আজকাল প্রকাশন ২.৭০ টাকা, ১২–১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

খেলা





শিলিগুড়িতে এবার সরস্বতী পূজোর মন্ডপে নেহরু কাপ শোভা পেয়েছে

ছবিঃ শান্তি সেন

খেলা

১২-১৮ ফেব্রুয়ারি বর্ষ ৬ সংখ্যা ৫০
আজকাল প্রকাশনের খেলার কাগজ

সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : স্বপন রায়
অন্যান্য ছবি : শান্তি সেন, প্রদীপ সেন, অজয় রায়, প্রেমিক দত্ত, রাজা বসু, সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ সাধু, সন্তুষ দে, প্রদীপ সাউ, অভিজিৎ তালুকদার এবং এস এস কাজিলাল।

অভিনন্দন

- তরুণ দে কে, মোহনবাগানের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে ইস্টবেঙ্গলে সই করার সিদ্ধান্ত ঠিক নয় – এই অন্যায় স্বীকার করার সৎসাহস দেখানোর জন্য।
- অমল দত্ত এবং শঙ্কর ব্যানার্জিকে, '৮৮ মরসুমে যথাক্রমে মহমেডান ও মোহনবাগান দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য।

ধিক্কার

- তরুণ দে কে, মোহনবাগানের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়েও সই না করে শেষ মুহূর্তে দলকে চরম বিপদে ফেলার জন্য।
- মজিদ বাসকারকে, আবার অন্ধকারময় জীবনযাপনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য।

প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। ফোন: ৩৫-৩৮৭১, ৩৫-৩৮৭২, ৩৫-৫৩০২, ৩৫-৫৫৭৪, ৩৫-৬০২৮

দাম ২টা ৭০ পয়সা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা, প্রতি কপি ২০ পয়সা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা।



গর্ব ধুলোয় মিশে গেল!

আপনি কোনও ক্রিকেটপ্রেমীকে জিজ্ঞাসা করুন: পাকিস্তানের সর্বকালের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ক্রিকেটারটির নাম কি? সপ্রতিভ উত্তর পাবেন: ইমরান খান। আপনি কোনও বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করুন, পাকিস্তানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডারের নাম কি? উত্তর পাবেন, ইমরান খান। আপনি কোনও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করুন, পাকিস্তানের কোন্ বোলারের হাতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসুইঙ্গার আছে? কাকাতুয়ার ঠোঁট নাড়িয়ে বুলি আওড়ানোর মতন উত্তর পাবেন – ইমরান খান। আবার কাউকে জিজ্ঞাসা করুন – কোন্ পাকিস্তানী ক্রিকেটারের মাঠে হাঁটাচলার মধ্যে (এটাও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ?) সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট? এক্ষেত্রেও নিশ্চিত উত্তর আপনার কানে ঠোক্কর মারবে – ইমরান খান। আট থেকে আশি – কোনও নারীকে আপনি পাশে ডেকে এনে নারীর হৃদস্পন্দন দ্রুত করা ক্রিকেটারটির নাম জিজ্ঞাসা করলেও আপনাকে ইমরান খান নামটি শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এবং-----সবশেষে, এই সেদিন থেকে ইমরান খান আরও একটি প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর হলেন: কোন্ ক্রিকেটার সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়ে, অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে, আশ্চর্যজনকভাবে আ-বা-র ফিরে এলেন, প্রেসিডেন্টের অনুরোধে?

হে ইমরান, তুমি যা করলে তা ক্রিকেটীয় কাজ হল না। অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আগে কত হাজারো অনুরোধ, প্রার্থনা, কত ক্রিকেটপ্রেমীর অনশনের খবর আমরা কাগজে পড়েছি, শুনেছি, দেখেছিও; ক্রিকেটাররা একত্রিত হয়ে তোমাকে অনুরোধ জানিয়েছে। তুমি কিন্তু কারও কথা শোনোনি। নিজের সিদ্ধান্তে এভারেস্টের চূড়ার মত অটল থেকে ব্যাট-বলকে গুডবাই জানিয়েছ নির্দিষ্ট সময়ে। অথচ গত ১১ জানুয়ারি একি করলে তুমি? হোন না তিনি জেনারেল জিয়া, হোন না তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট। তার অনুরোধ রেখে তুমি আবার পুরনো সিদ্ধান্ত ঢোক গিলে অনেকটা নির্লজ্জ, বেহায়ার মতনই ফিরে এলে। তোমার যুক্তি – প্রেসিডেন্টের অনুরোধে আমি গর্বিত। কিন্তু এটাতো ঠিক, রাজনীতির জগতে জিয়া যেমন, যতটা গণ্যমান্য, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, পাক ক্রিকেটের আঙিনায় তুমিও ঠিক ততটাই, সোজা কথায় একমেবাদ্বিতীয়ম। আর তাহলে তো মুখের কথারও নিশ্চয় একটা মূল্য থাকা উচিত। টাকা-পয়সা দিয়ে যার বিচার করা যায় না। আমাদের সানিকে দেখো। এই ক্রিকেট দেবতাকে নিয়ে আমাদের গর্ব কিন্তু এমনিতেই নয়। সারা দেশের তাবড় তাবড় রাজনীতিবিদরাও যখন কথার খেলাপ করে যাচ্ছেন অনায়াসে, তখন এই মানুষটি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছেন হিমালয়ের মতন। উদাহরণ? ইডেনে আর কোনদিন না খেলা। আর দ্বিতীয় উদাহরণ তো আজ ইতিহাস। আর কোনদিন ব্যাট স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা। আমি তো জীবন বাজি ফেলতে প্রস্তুত – যদি কলকাতার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে তবুও সানি তার সিদ্ধান্ত থেকে আধচুল সরবেন না। প্রকৃত মানুষ, সাচ্চা মর্দ কা জওয়ান কিন্তু এরাই। আর তুমি? সামান্য মুখের কথার দাম দিতে পারলে না। সত্যি বলছি, এশিয়াবাসী হিসেবে তোমার জন্য এতদিন যতটুকু গর্ববোধ করতাম তা ঐ ৩১ জানুয়ারি থেকেই ধুলায় মিশে গেছে। হাঁ, সম্পূর্ণ। যে যাই বলুক, বিশ্বের যত ক্রিকেটপ্রেমীই তোমার প্রত্যাবর্তনে খুশি হোক না কেন, এই নগণ্য ইমরান-প্রেমী কিছুতেই তোমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারল না।

সুকান্ত পোদ্দার
রামঘাঁট, বার্ণপুর

জন্মদিনের আলোয় সামান্য কয়েকটা আবেদন.....

আগত প্রতিটি নতুন জন্মদিনই আগামী ভবিষ্যতের আশা ওসম্ভাবনার দ্যোতক। যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড় নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।" – ধ্রুব সত্যি সন্দেহ নেই, তবুও প্রত্যেকটি পরিণত বছরের বিদায়প্রান্তে প্রায় সবাই-ই উদ্বেলিত হন নতুন প্রতিজ্ঞা-প্রেরণা-চিন্তা ও ভাবনায়, মুহূর্তের জন্যে হলেও। আর সেই সঙ্গে নতুন ভাবনায় আলোড়িত হন একান্ত প্রিয়জনেরাও।

আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি '৮৮-তে প্রিয় "খেলা" পা দিচ্ছে সাতের কোঠায়, বয়সে, নাবালক হলেও পরিণতিতে যে অনেক আগেই সাবালকত্বের ছাড়পত্র পেয়েছে। অনেক উষ্ণ অভিনন্দন, অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা রইল "খেলা"র সাংবাদিকবর্গসহ অন্যান্য কর্মী এবং সম্পাদকের জন্য। এবং কিঞ্চিৎ বাড়তি অভিনন্দনও থাকছে প্রাক্-জন্মজয়ন্তীতেই আমাদের পাঠক/পাঠিকাদের, আর্টপেপারের চমকে ঝকমকে প্রচ্ছদ-শোভিত "খেলা" উপহার দেবার জন্যে।

এবার বরং পেশ করা যাক নতুন বছরের কিছু দাবি-দাওয়া ও অনুরোধ।

(১) ফুটবল-ক্রিকেটের গ্ল্যামার ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত খেলাগুলোর জন্য প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে "খেলা"র বেশ কয়েকটি পাতা বরাদ্দ করা হোক। এ সম্পর্কে প্রয়োজনে পাঠক/পাঠিকাদের কাছ থেকেও মতামত আহ্বান করা যেতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা কী চান?



(২) "খেলা"-তে সুনীল গাভাসকারের লেখা নিয়মিতভাবে (প্রতি সপ্তাহে কিংবা এক সপ্তাহ অন্তর) পেতে আমরা দারুণ আগ্রহী।

(৩) এছাড়া, বিভিন্ন খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কীর্তিমান কিছু বিদেশী নক্ষত্রের লেখা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনা মাঝে মধ্যে "খেলা"য় দেখতে পেলে ভাল লাগবে।

(৪) "খেলা" প্রকাশিত হবার কোন নির্দিষ্ট দিন আজ প্রায় বছরখানেক ধরে নেই (মানে তা মানা হচ্ছে না) খেয়াল-খুশিমত বেরোয়। অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনে (শুক্রবার) "খেলা" প্রকাশের ব্যবস্থা হোক।

(৫) "সম্পাদকের কাছে"র পাতার পরিমাণ অনেক অনুরোধের পর ১ পৃষ্ঠা থেকে ১½ পৃষ্ঠা করা গিয়েছিল, কিন্তু, প্রায়শই ঐ বাড়তি আধ পৃষ্ঠাও পাঠক/পাঠিকাদের কলম এড়িয়ে বিজ্ঞাপনের দখলে চলে যায়, যেটা অবশ্যই কাম্য নয় এবং ওটা বন্ধ করা হোক।

– আপাতত, নতুন জন্মদিনের আলোয় সামান্য এই কয়েকটা আবেদন নিয়ে আমরা তাকিয়ে থাকব আগামী বছরটির দিকে। এবং আবারও একবার "খেলা"কে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই।

দেবযানী চ্যাটার্জি। রানাঘাট। নদীয়া

ভুল নয়, অপরাধ



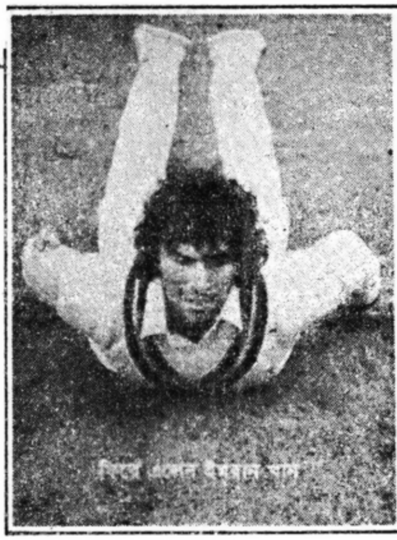


অশোক দাশগুপ্ত

জুতো না পরলে সত্যিই বোঝা যায়না, তার মধ্যে কাঁটাটা কোথায়। তবু, কখনও নির্বাচক না হয়েও একটু একটু বুঝতে শিখেছি, নির্বাচকদের সমস্যাটা কোথায়। একই সংগে সবাইকে খুশি করা নিশ্চয় সম্ভব নয়। একজন ভাবতে পারেন, টেস্ট ক্রিকেটে শিবলাল যাদবের মত প্রথাসিদ্ধ স্পিনারেরই টীমে থাকা উচিত। অন্যজন চাইতে পারেন আরশাদ আয়ুবকে, আঁটো বোলিং এবং একটু ভাল ব্যাটিংয়ের জন্য। তৃতীয় জন দুটি যুক্তিকেই আবার যাদবকে প্রধানত এই কারণে পছন্দ করে ফেলতে পারেন যে আয়ুবের ফিল্ডিংটা বড়ই বাজে। একদিনের ম্যাচে হিরওয়ানিকে বাদ দিতে চাইতে পারেন কেউ,কেননা এই লেগস্পিনার এতটাই মার খেতে পারেন যে অন্যদের পক্ষে হাজার চেষ্টা করেও হার এড়ানো কঠিন হতে পারে। অন্য কেউ এই যুক্তিতে হিরওয়ানিকে চাইতে পারেন যে একাই ম্যাচ ঘোরাতে পারেন কোনও বিশেষ দিনে এই লেগ স্পিনারটি এবং বাজে বল খেললে আজহারউদ্দিন বা মহিন্দারকে ব্যবহার করার একটা সুযোগ তো থেকেই যাচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে যত মাথা তত মত,— এ ধরনের ব্যাপার দাঁড়াতেই পারে। নির্বাচকদের সমালোচনা করার আগে এবং করার সময় এসব কথা মনে রাখা উচিত, চল্লিশ ছুঁতে ছুঁতে একথা বোঝার মত বুদ্ধি আমার গজিয়েছে। বাংলার নির্বাচকরা, সুতরাং, একথা বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা না করলেই ভাল করবেন না যে কোনও নির্বাচকই একসংগে সবাইকে খুশি করতে পারেনা।

পি বি দত্ত, অম্বর রায়, সমর চক্রবর্তী এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জির কাছে আমাদের দুটি প্রশ্ন। এক, অরুণলালকে কিছু ম্যাচে পাওয়া যাবে জেনেও তাঁরা গোটা মরসুমের জন্য প্রণব রায়কে অধিনায়ক করেছিলেন কেন? গত দু-তিন বছরে জাতীয় ক্রিকেটে বাংলার যতটুকু পারফরমেন্স, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই অরুণলাল। বোম্বাই কি দিলীপ বেংগসরকারের বদলে চন্দ্রকান্ত পন্ডিতকে গোটা মরসুমের জন্য অধিনায়ক করেছে? ভেবে দেখুন, বোম্বাই দলে দিলীপ বেংগসরকার যা, বাংলা দলে অরুণলাল তার চেয়ে অনেক বেশি (শ্রীযুক্ত রাজু মুখার্জি ইনিয়ে বিনিয়ে যা-ই বলার চেষ্টা করুননা কেন)। এই অরুণলালকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে অপমান করার নৈতিক অধিকার নির্বাচকদের কে দিয়েছে? নির্বাচকরা সকলেই নামী প্রাক্তন ক্রিকেটার, অন্তত দুজন সর্বভারতীয় স্তরেও যথেষ্ট স্বীকৃত। এঁরা কি একবারও ভেবেছিলেন যে এই সিদ্ধান্ত কতখানি আঘাত দেবে অরুণলালকে, যিনি এতখানি দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন বাংলার ক্রিকেটকে? অরুণলালকে না পেলে, প্রণবকে অধিনায়ক করা যেতেই পারে। কিন্তু গোটা মরসুমের জন্য? কেন?

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, গোটা মরসুমের জন্য যিনি অধিনায়ক, তাঁকে ওড়িশা ম্যাচে বাদ দেওয়া হল কেন? এই ব্যাপারটাকে দুদিক থেকে দেখতে হবে। প্রথমত, গোটা মরসুমের জন্য নির্বাচিত অধিনায়ককে খারাপ পারফরমেন্সের জন্য বাদ দেওয়া যায় না। তাহলে অনেক অধিনায়ককেই মাঝপথে বাদ পড়তে হত। মাইক ডেনেসের মত কেউ যদি নিজেই সরে দাঁড়ান আলাদা কথা, বাদ দেবার অধিকার কারও নেই। সি এ বি সচিবের এই বক্তব্য নিতান্তই হাস্যকর যে পারফরমেন্স না থাকলে অধিনায়ককেও বাদ দেওয়া যায়। যায়, যদি তাঁকে ভাগে ভাগে এক-একটি ম্যাচের জন্য অধিনায়ক করা হয়। ক্রিকেটে এমন নজির কখনও কোথাও নেই। যাঁকে গোটা মরসুমের জন্য অধিনায়ক করা হচ্ছে, তিনি তো দলে থাকার পক্ষে এতটাই উপযুক্ত হতে বাধ্য যে তিন চার ম্যাচের খারাপ পারফরমেন্সে কিছুই যায় আসেনা। এবার দ্বিতীয় দিক। কী এমন ভাল ব্যাটসম্যানে ভরে গেল সোনার বাংলা যে প্রণব রায়কে দল থেকেই বার করে দিতে হয়? প্রণব সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যাটসম্যান। টেস্ট খেলেছেন মামা বা বাবার জোরে নয়, নিজের যোগ্যতায়। এখনও, বাংলার ইনিংস গড়ার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার এই প্রণবকেই। এমন ব্যাটসম্যান দু-তিনটে ম্যাচে রান না পেলে বরং এই আশাই করা উচিত যে এবার রান পাবার সময় এসেছে। পঞ্চাশ-ষাট সত্তরের ভাল ইনিংস নয়, দাঁড়িয়ে গেলে দুশো রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলতে পারে এই প্রণব রায়, কোনও উদীয়মান নক্ষত্র নয়। গাভাসকার, বেংগসরকার, বিশ্বনাথরা ব্যর্থ হননি তিন-চারটে ম্যাচে টানা? কেউ বাদ দেবার কথা ভেবেছে? ভারতীয় দলের কাছে ওঁরা যা ছিলেন বা আছেন, বাংলা দলে প্রণবও প্রায় সেরকমই। ওকে বাদ দেওয়া শুধু ভুল নয়, অন্যায়, অমার্জনীয় অপরাধ। এটা খুবই আনন্দের কথা যে আই বি রায়, জয়দীপ মুখার্জি, স্নেহাশিস গাংগুলিরা উঠে আসছে। কিন্তু একটা ম্যাচে কোনও তরুণকে বসতে হবে বলে পেন পেন্সিল কামড়ে প্রণবকেই ছাঁটাই করে দিতে হবে, এটা মানা যায়না। ওড়িশার বিরুদ্ধে বাংলা প্রয়োজনীয় পয়েন্ট পেয়ে নক-আউট পর্যায়ে যেতে পারলে ভাল। যদি যায়, নির্বাচকরা দয়া করে প্রণবকে টীমে ফেরান। না ফেরালে, লোকে নানা কুকথা বলবে। আর আমরা? নিশ্চয় ক্লাবহাউসে ইটপাটকেল মারবনা। তবে যা পারি তা করব। একটু লেখালেখি করব। ভুল বললাম, একটু না, খুব বেশি। নির্বাচকরা মানী লোক, এসব লেখালেখি কিন্তু তাঁদের পক্ষে স্বস্তিকর হবে না।



ফিরে এলেন ইমরান খান

বোঝাই গেল, ইমরানের স্থান ঠিক কোথায়

সুনীল গাভাসকার



যখনও অবসর নেননি ওঁরা। ছবি : স্বপন চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে 'স্পোর্টস উইক' পত্রিকার পক্ষ থেকে ইমরান খানের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎকার দিনের আলো দেখার তিন-চারদিনের মধ্যেই গোটা দুনিয়া জেনে যায় যে অবসরের সিদ্ধান্ত ভেঙে এই সুদর্শন দানব আবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে আসছে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমিও ওকে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। ইমরান কিছু উত্তরে বলেছিল, 'পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং সহ খেলোয়াড়দের দিক থেকে চাপ আছে, কিন্তু না, আমি ফিরছি না।' ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর তার সঙ্গে আমার দেখা বা ট্রাঙ্ককলে কথা হয়নি। আমি শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরটুকুই দেখেছি – জেনারেল জিয়ার অনুরোধে, দেশের একজন সৈনিক হিসাবেই ইমরান ফিরে এল। কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব – যদিও ইংল্যান্ড এক নৈশভোজের আসরে জেনারেল জিয়ার এ ধরনের ইঙ্গিতকে খুব বেশি গুরুত্ব সে দেয়নি।

এম সি সি দ্বিশতবার্ষিকী ম্যাচে

আমি আর ইমরান একইসঙ্গে ছিলাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশে। শুধু তাই নয়, সেই প্রথম কোন ম্যাচে ব্যাট হাতে আমি আর সে একইসঙ্গে ক্রিজে ছিলাম। ৮২ রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিল ইমরান। দুর্ভাগ্য, সেঞ্চুরি পায়নি। পরে আমাকে বলল, 'সুনীল, তুমি ১৮৮ রান করলে। সেঞ্চুরিটা পেলে আমারও ভাল লাগত। এটাই যে আমাদের দুজনের শেষ পাঁচদিনের ম্যাচ।' হ্যাঁ, মানসিক প্রস্তুতি সে অনেকদিন আগেই নিয়ে ফেলেছিল।

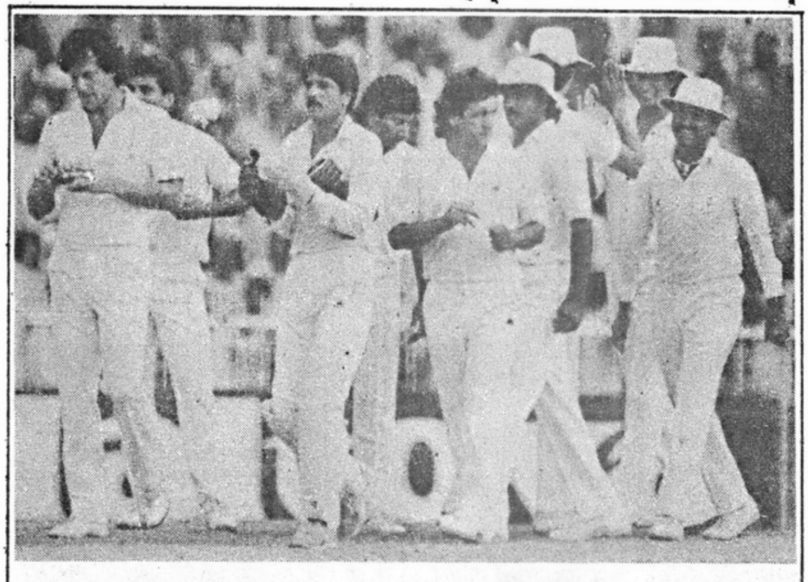
ইমরান শেষ ম্যাচ খেলেছে লাহোরে, রিলায়েন্স কাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। খেলা যখন ছেড়েছিল, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ছিল দলের এক নম্বর ক্রিকেটার, সবচেয়ে যোগ্য নেতা। অধিনায়ক হিসাবে ইমরানের পর যাকেই ভাবুক পাকিস্তান, একটা বড় ধরনের তফাত থাকেই। ইমরানহীন পাকিস্তান অনেকটা মাস্তুলহীন জাহাজের মত। ইমরানের সরে যাওয়াটা ছিল পাকিস্তান ক্রিকেটের চরম ক্ষতি। বিশ্বের দরবারে যে কটা ব্যাপারে পাকিস্তান গর্ব করে, তার মধ্যে এক নম্বরে আছে ক্রিকেট। সম্ভবত সেই কারণেই ইমরানকে ফিরিয়ে আনার জন্য গোটা দেশ মরীয়া হয়ে উঠেছিল, অনুরোধ, চাপ, অনশন ধর্মঘটের হুমকি, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রনায়কের অনুরোধ। দেশের এই শ্রেষ্ঠ সেনাপতিটির জনপ্রিয়তা কতটা, শ্রদ্ধার বিচারে কোথায় তাঁর স্থান, সে তো সহজেই অনুমেয়।

ইমরান কত বড় ক্রিকেটার, সেকথা নতুন করে বলার মূর্খতা আমি দেখাতে চাই না। আলোচনা তাই সীমাবদ্ধ রাখছি শুধু তার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, অবসর নেওয়ার পরও এভাবে ফিরে আসা ইমরানের উচিত হয়েছে কিনা। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভাবনা চিন্তাটা তারই। ও প্রচন্ড বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। চারদিক ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু একটা ব্যাপার অনুমান করতে পারি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ও বেশ কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছে। এতদিন যে মাঠে মাথা উঁচু করে লড়াই করে বিশ্রামের কথা ভেবেছিল, ফিরে আসা বা না আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সম্পূর্ণ তার নিজের।

সবাই জানেন, ছাপার অক্ষরেই পড়েছেন, ইমরানের দুটি টার্গেট ছিল। ভারতের মাটিতে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডকে হারানো। দুটো টার্গেটেই সে সফল। অনেকে যা ভেবেছিলেন, সেটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি জানি, রিলায়েন্স কাপ তার টার্গেট ছিল না। আমাকে বলেছিল, একদিনের ম্যাচে হঠাৎ একটা কিছু ঘটে যেতে পারে, কিন্তু টেস্টসিরিজ অন্য জিনিস, এখানে অনেক অঙ্ক কষতে হয়। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা নেই, এবার সামনে তার তৃতীয় টার্গেট – ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানো। ইমরান ফিরে আসায় পাকিস্তান দলের শক্তি শতকরা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেল। খেলা ছাড়ার পর আমার তো ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, ইমরান কিন্তু দুই মাসে নিজেকে আরও ঝরঝরে এবং ফিট করে তুলেছে। এই ফিটনেস-ফ্যানাটিক আগের মতই পারফরমেন্স দেখাবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট উইকেটে মার্শাল প্যাটারসনের বিরুদ্ধে ইমরান আক্রমণ – কি রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধই না অপেক্ষা করছে। তাজা সবুজ উইকেট, বল হাতে ছুটে আসছে ইমরান খান,..... আহা, কি মধুর দৃশ্য!



শারজা গ্যালারি। ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়





ওরেলের ভূমিকা পালন করবে ইমরান

• গোপাল বসু •

ইংরেজ নির্বাচকরা তখন আতঙ্কে ভুগছিলেন। বিধ্বংসী ফাস্ট বোলিং জুটি লিন্ডওয়াল এবং মিলার ইংল্যান্ডের ব্যাটিংকে চুরমার করে দিচ্ছেন। ক্রাচহীন খোঁড়া লোকের মতই তখন ইংল্যান্ড দলের অবস্থা। রুগীর জন্য চিকিৎসক যে ওষুধ দিয়েছেন, তা কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না – একজন যোগ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান। নির্বাচকরা মাথা ঘামিয়ে কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু হঠাৎই একজন নির্বাচকের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সহ-নির্বাচককে তিনি বললেন, 'সিরিল (ওয়াশব্রুক), দয়া করে এক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে যাবে? ঠিক ষাট সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা তোমাকে ডেকে নেব। আমাদের ওপর ভরসা রাখ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা এমন কিছু করব না, যা তোমার অথবা ইংল্যান্ডের ভাবমূর্তির ক্ষতি করতে পারে। বিস্ময়ে হতবাক ওয়াশব্রুককে ঘরের বাইরে যেতে হয়। এক মিনিট হওয়ার আগেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি জানতেন না, কী চরম বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি ঘরে ঢুকতেই ঘোষিত হল কণ্ঠস্বর: 'সিরিল, (সামান্য নাটকীয় বিরতির পর) পরের টেস্টে তুমিই ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরু করছ। এটাই আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ইংল্যান্ড তোমাকেই চায়। দলে তোমাকে ভীষণ দরকার।'

অবসরের পর ওয়াশব্রুকের আবার ইংল্যান্ড দলে ফিরে আসার এই হল নেপথ্যকাহিনী। প্রত্যাবর্তনেই তিনি খেলেছিলেন ৯৮ রানের দুর্ধর্ষ, অবিশ্বাস্য ইনিংস। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন। এরপর অনেক প্রত্যাবর্তনই ঘটেছে। কয়েকটি রীতিমত গৌরবোজ্জ্বল। দুটি জ্বলন্ত উদাহরণ – স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এবং ববি সিম্পসন। এখন প্রশ্ন এটাই: কেন ঘটে এই প্রত্যাবর্তন? তা কি সত্যিই একান্ত জরুরী? আসলে প্রত্যাবর্তনের কারণ দুটি। এক, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেশের জরুরী ডাক। উদাহরণ – সিরিক ওয়াশব্রুকই, এবং দুই, দীর্ঘ সময়ের জন্য ডাক। যেমন – স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, ববি সিম্পসন (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দীর্ঘায়িত হওয়ার দরকার হয়নি, কারণ প্যাকার সিরিজের ক্রিকেটারদের ওপর থেকে দ্রুতই নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছিল)। কিন্তু, এসব কি সত্যিই খুব জরুরী? হ্যাঁ, কখনও কখনও নিশ্চিতভাবেই জরুরী! এটা মাঝেমধ্যে অলৌকিক কাজ করে, যেমন ওরেলের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। গারফিল্ড সোবার্স, রোহন কানহাই, ওয়েসলি হল, ল্যান্স গিবসদের মত অসাধারণ নক্ষত্রদের তিনিই প্রথম উপহার দিয়েছিলেন ধ্বংসাত্মক যন্ত্রটি, যা পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সোবার্স, কানহাই, লয়েডরা। এবং এখন ভিভিয়ান রিচার্ডস। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের পতাকাটা যদি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল নিজের হাতে তুলে না নিতেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পরিণত হত একঝাঁক প্রতিভাবান নক্ষত্রের সমষ্টিতে, যারা অসাধারণ ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে বিশ্বাসী, দলগত নয়। যাদের উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া, জেতা নয়। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে ওরেলের ভূমিকা অসামান্যই। ক্রিকেটার হিসাবে এমন কিছু নয়, কিন্তু নেতা হিসাবে? তিনিই তৈরি করেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

> ব্যর্থতা যদি আসেই বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, ইমরান পাশেই থাকবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ভুল-ত্রুটি, বলে দেবে ঠিক কী করতে হবে। সাফল্যের জন্য এটাই সবচেয়ে জরুরী।

প্রত্যাবর্তনের শেষ উদাহরণ ইমরান খান। সে স্যার ওরেলের ভূমিকাই পালন করবে। তবে, এটা স্বীকার না করে উপায় নেই, একটা বড়সড় তফাতও আছে। ওরেল যখন ফিরে এসেছিলেন, নিজের সেরা সময় পেছনেই ফেলে এসেছিলেন। কিন্তু ইমরান খান? এখনও বিরাজ করছে দল তার স্বর্ণচূড়ায়? অধিনায়ক হিসাবে তার ভূমিকা যত বড়ই হোক, ক্রিকেটার হিসাবে অবদান নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম হবে।

আগে বলা হত সবচেয়ে কঠিন সফর ইংল্যান্ডের মাটিতেই। এখন আর তা নেই। সবচেয়ে কঠিন নিশ্চয়ই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। তাদের মাটিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জয় করার জন্য এটাই দরকার – পাকিস্তানের অন্যদের অনভিজ্ঞতার সংগে ইমরানের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ। পাকিস্তানের নির্বাচকরা ভাল করেই জানেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজে এমন পিচ কোথাও পাওয়া যাবে না, যা এক ইঞ্চিও টার্ন উপহার দেবে। সুতরাং পাকিস্তানের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচউইনার আব্দুল কাদিরের এবার কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। পাকিস্তান যদি সিরিজ জিততে চায়, পেস আক্রমণের ওপরই, প্রধানত ইমরান আর আক্রামের ওপরই নির্ভর করতে হবে। আক্রামেরও ম্যাচউইনার হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে নিজের এই ক্ষমতাটুকু অনুধাবন করতে পারল না। এবং এখানেই আসবে ইমরানের অভিভাবকত্ব ও অভিজ্ঞতা। কীভাবে? একজন ব্যাটসম্যানের মত একজন বোলারকেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আবহাওয়া, পরিবেশ ইমরানের অধিকাংশ সহযোদ্ধার কাছেই নতুন, যদিও তা ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার মত খামখেয়ালী নয়। পাকিস্তান দলে তরুণ ব্যাটসম্যানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রামিজ রাজা, সেলিম মালিক, শোয়াইব মহম্মদ, ইজাজ আমেদ----। ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজই বাকি। বিশ্ব ক্রিকেট সার্কিট ইমরান সম্পূর্ণ করে ফেলছে। এই তরুণদের দলটি সফল হবে কি হবে না, সে ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নেই, তা কেউই দিতে পারে না। ব্যর্থতা যদি থেকেই বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, ইমরান পাশেই থাকবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ভুলত্রুটি, বলে দেবে ঠিক কী করতে হবে এবং কী করা উচিত নয়। সাফল্যের জন্য এটাই সবচেয়ে জরুরী, এটাই চাবিকাঠি। চাবিটা পাওয়া গেলে তালা খুলে ফেলা কি খুব কঠিন?

ভুল নয়, অপরাধ



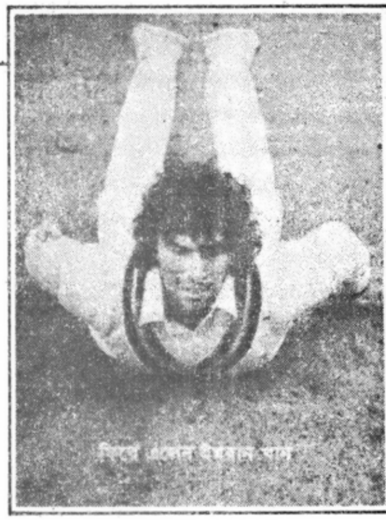


অলোকপ্রসাদ গুপ্ত

জুতো না পরলে সত্যিই বোঝা যায়না, তার মধ্যে কাঁটাটা কোথায়। তবু, কখনও নির্বাচক না হয়েও একটু একটু বুঝতে শিখেছি, নির্বাচকদের সমস্যাটা কোথায়। একই সংগে সবাইকে খুশি করা নিশ্চয় সম্ভব নয়। একজন ভাবতে পারেন, টেস্ট ক্রিকেটে শিবলাল যাদবের মত প্রথাসিদ্ধ স্পিনারেরই টীমে থাকা উচিত। অন্যজন চাইতে পারেন আরশাদ আয়ুবকে, আঁটো বোলিং এবং একটু ভাল ব্যাটিংয়ের জন্য। তৃতীয় জন দুটি যুক্তিকেই আবার যাদবকে প্রধানত এই কারণে পছন্দ করে ফেলতে পারেন যে আয়ুবের ফিল্ডিংটা বড়ই বাজে। একদিনের ম্যাচে হিরওয়ানিকে বাদ দিতে চাইতে পারেন কেউ,কেননা এই লেগস্পিনার এতটাই মার খেতে পারেন যে অন্যদের পক্ষে হাজার চেষ্টা করেও হার এড়ানো কঠিন হতে পারে। অন্য কেউ এই যুক্তিতে হিরওয়ানিকে চাইতে পারেন যে একাই ম্যাচ ঘোরাতে পারেন কোনও বিশেষ দিনে এই লেগ স্পিনারটি এবং বাজে বল খেললে আজহারউদ্দিন বা মহিন্দারকে ব্যবহার করার একটা সুযোগ তো থেকেই যাচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে যত মাথা তত মত — এ ধরনের ব্যাপার দাঁড়াতেই পারে। নির্বাচকদের সমালোচনা করার আগে এবং করার সময় এসব কথা মনে রাখা উচিত, চল্লিশ ছুঁতে ছুঁতে একথা বোঝার মত বুদ্ধি আমার গজিয়েছে। বাংলার নির্বাচকরা, সুতরাং, একথা বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা না করলেই ভাল করবেন না যে কোনও নির্বাচকই একসংগে সবাইকে খুশি করতে পারেনা।

পি বি দত্ত, অম্বর রায়, সমর চক্রবর্তী এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জির কাছে আমাদের দুটি প্রশ্ন। এক, অরুণলালকে কিছু ম্যাচে পাওয়া যাবে জেনেও তাঁরা গোটা মরসুমের জন্য প্রণব রায়কে অধিনায়ক করেছিলেন কেন? গত দু-তিন বছরে জাতীয় ক্রিকেটে বাংলার যতটুকু পারফরমেন্স, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই অরুণলাল। বোম্বাই কি দিলীপ বেংগসরকারের বদলে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে গোটা মরসুমের জন্য অধিনায়ক করেছে? ভেবে দেখুন, বোম্বাই দলে দিলীপ বেংগসরকার যা, বাংলা দলে অরুণলাল তার চেয়ে অনেক বেশি (শ্রীযুক্ত রাজু মুখার্জি ইনিয়ে বিনিয়ে যা-ই বলার চেষ্টা করুননা কেন)। এই অরুণলালকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে অপমান করার নৈতিক অধিকার নির্বাচকদের কে দিয়েছে? নির্বাচকরা সকলেই নামী প্রাক্তন ক্রিকেটার, অন্তত দুজন সর্বভারতীয় স্তরেও যথেষ্ট স্বীকৃত। এঁরা কি একবারও ভেবেছিলেন যে এই সিদ্ধান্ত কতখানি আঘাত দেবে অরুণলালকে, যিনি এতখানি দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন বাংলার ক্রিকেটকে? অরুণলালকে না পেলে, প্রণবকে অধিনায়ক করা যেতেই পারে। কিন্তু গোটা মরসুমের জন্য? কেন?

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, গোটা মরসুমের জন্য যিনি অধিনায়ক, তাঁকে ওড়িশা ম্যাচে বাদ দেওয়া হল কেন? এই ব্যাপারটাকে দুদিক থেকে দেখতে হবে। প্রথমত, গোটা মরসুমের জন্য নির্বাচিত অধিনায়ককে খারাপ পারফরমেন্সের জন্য বাদ দেওয়া যায় না। তাহলে অনেক অধিনায়ককেই মাঝপথে বাদ পড়তে হত। মাইক ডেনেসের মত কেউ যদি নিজেই সরে দাঁড়ান আলাদা কথা, বাদ দেবার অধিকার কারও নেই। সি এ বি সচিবের এই বক্তব্য নিতান্তই হাস্যকর যে পারফরমেন্স না থাকলে অধিনায়ককেও বাদ দেওয়া যায়। যায়, যদি তাঁকে ভাগে ভাগে এক-একটি ম্যাচের জন্য অধিনায়ক করা হয়। ক্রিকেটে এমন নজির কখনও কোথাও নেই। যাঁকে গোটা মরসুমের জন্য অধিনায়ক করা হচ্ছে, তিনি তো দলে থাকার পক্ষে এতটাই উপযুক্ত হতে বাধ্য যে তিন চার ম্যাচের খারাপ পারফরমেন্সে কিছুই যায় আসেনা। এবার দ্বিতীয় দিক। কী এমন ভাল ব্যাটসম্যানে ভরে গেল সোনার বাংলা যে প্রণব রায়কে দল থেকেই বার করে দিতে হয়? প্রণব সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যাটসম্যান। টেস্ট খেলেছেন মামা বা বাবার জোরে নয়, নিজের যোগ্যতায়। এখনও, বাংলার ইনিংস গড়ার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার এই প্রণবকেই। এমন ব্যাটসম্যান দু-তিনটে ম্যাচে রান না পেলে বরং এই আশাই করা উচিত যে এবার রান পাবার সময় এসেছে। পঞ্চাশ-ষাট সত্তরের ভাল ইনিংস নয়, দাঁড়িয়ে গেলে দুশো রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলতে পারে এই প্রণব রায়, কোনও উদীয়মান নক্ষত্র নয়। গাভাসকার, বেংগসরকার, বিশ্বনাথরা ব্যর্থ হননি তিন-চারটে ম্যাচে টানা? কেউ বাদ দেবার কথা ভেবেছে? ভারতীয় দলের কাছে ওঁরা যা ছিলেন বা আছেন, বাংলা দলে প্রণবও প্রায় সেরকমই। ওকে বাদ দেওয়া শুধু ভুল নয়, অন্যায়, অমার্জনীয় অপরাধ। এটা খুবই আনন্দের কথা যে আই বি রায়, জয়দীপ মুখার্জি, স্নেহাশিস গাংগুলিরা উঠে আসছে। কিন্তু একটা ম্যাচে কোনও তরুণকে বসতে হবে বলে পেন পেন্সিল কামড়ে প্রণবকেই ছাঁটাই করে দিতে হবে, এটা মানা যায়না। ওড়িশার বিরুদ্ধে বাংলা প্রয়োজনীয় পয়েন্ট পেয়ে নক-আউট পর্যায়ে যেতে পারলে ভাল। যদি যায়, নির্বাচকরা দয়া করে প্রণবকে টীমে ফেরান। না ফেরালে, লোকে নানা কুকথা বলবে। আর আমরা? নিশ্চয় ক্লাবহাউসে ইটপাটকেল মারবনা। তবে যা পারি তা করব। একটু লেখালেখি করব। ভুল বললাম, একটু না, খুব বেশি। নির্বাচকরা মানী লোক, এসব লেখালেখি কিন্তু তাঁদের পক্ষে স্বস্তিকর হবে না।



বোঝাই গেল, ইমরানের স্থান ঠিক কোথায়

সুনীল গাভাসকার



যখনও অবসর নেননি ওঁরা। ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে 'স্পোর্টস উইক' পত্রিকার পক্ষ থেকে ইমরান খানের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎকার দিনের আলো দেখার তিন-চারদিনের মধ্যেই গোটা দুনিয়া জেনে যায় যে অবসরের সিদ্ধান্ত ভেঙে এই সুদর্শন দানব আবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে আসছে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমিও ওকে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। ইমরান কিছু উত্তরে বলেছিল, 'পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং সহ খেলোয়াড়দের দিক থেকে চাপ আছে, কিন্তু না, আমি ফিরছি না।' ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর তার সঙ্গে আমার দেখা বা ট্রাঙ্ককলে কথা হয়নি। আমি শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরটুকুই দেখেছি – জেনারেল জিয়ার অনুরোধে, দেশের একজন সৈনিক হিসাবেই ইমরান ফিরে এল। কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব – যদিও ইংল্যান্ড এক নৈশভোজের আসরে জেনারেল জিয়ার এ ধরনের ইঙ্গিতকে খুব বেশি গুরুত্ব সে দেয়নি।

এম সি সি দ্বিশতবার্ষিকী ম্যাচে

আমি আর ইমরান একইসঙ্গে ছিলাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশে। শুধু তাই নয়, সেই প্রথম কোন ম্যাচে ব্যাট হাতে আমি আর সে একইসঙ্গে ক্রিজে ছিলাম। ৮২ রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিল ইমরান। দুর্ভাগ্য, সেঞ্চুরি পায়নি। পরে আমাকে বলল, 'সুনীল, তুমি ১৮৮ রান করলে। সেঞ্চুরিটা পেলে আমারও ভাল লাগত। এটাই যে আমাদের দুজনের শেষ পাঁচদিনের ম্যাচ।' হ্যাঁ, মানসিক প্রস্তুতি সে অনেকদিন আগেই নিয়ে ফেলেছিল।

ইমরান শেষ ম্যাচ খেলেছে লাহোরে, রিলায়েন্স কাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। খেলা যখন ছেড়েছিল, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ছিল দলের এক নম্বর ক্রিকেটার, সবচেয়ে যোগ্য নেতা। অধিনায়ক হিসাবে ইমরানের পর যাকেই ভাবুক পাকিস্তান, একটা বড় ধরনের তফাত থাকেই। ইমরানহীন পাকিস্তান অনেকটা মাস্তুলহীন জাহাজের মত। ইমরানের সরে যাওয়াটা ছিল পাকিস্তান ক্রিকেটের চরম ক্ষতি। বিশ্বের দরবারে যে কটা ব্যাপারে পাকিস্তান গর্ব করে, তার মধ্যে এক নম্বরে আছে ক্রিকেট। সম্ভবত সেই কারণেই ইমরানকে ফিরিয়ে আনার জন্য গোটা দেশ মরীয়া হয়ে উঠেছিল, অনুরোধ, চাপ, অনশন ধর্মঘটের হুমকি, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রনায়কের অনুরোধ। দেশের এই শ্রেষ্ঠ সেনাপতিটির জনপ্রিয়তা কতটা, শ্রদ্ধার বিচারে কোথায় তাঁর স্থান, সে তো সহজেই অনুমেয়।

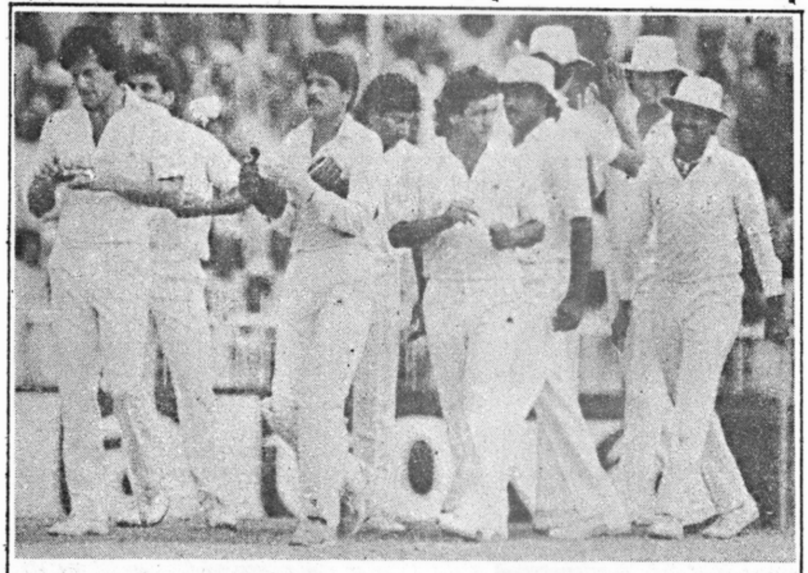
ইমরান কত বড় ক্রিকেটার, সেকথা নতুন করে বলার মূর্খতা আমি দেখাতে চাই না। আলোচনা তাই সীমাবদ্ধ রাখছি



পারজা গ্যালারি। ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

শুধু তার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, অবসর নেওয়ার পরও এভাবে ফিরে আসা ইমরানের উচিত হয়েছে কিনা। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভাবনা চিন্তাটা তারই। ও প্রচন্ড বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। চারদিক ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু একটা ব্যাপার অনুমান করতে পারি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ও বেশ কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছে। এতদিন যে মাঠে মাথা উঁচু করে লড়াই করে বিশ্রামের কথা ভেবেছিল, ফিরে আসা বা না আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সম্পূর্ণ তার নিজের।

সবাই জানেন, ছাপার অক্ষরেই পড়েছেন, ইমরানের দুটি টার্গেট ছিল। ভারতের মাটিতে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডকে হারানো। দুটো টার্গেটেই সে সফল। অনেকে যা ভেবেছিলেন, সেটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি জানি, রিলায়েন্স কাপ তার টার্গেট ছিল না। আমাকে বলেছিল, একদিনের ম্যাচে হঠাৎ একটা কিছু ঘটে যেতে পারে, কিন্তু টেস্টসিরিজ অন্য জিনিস, এখানে অনেক অঙ্ক কষতে হয়। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা নেই, এবার সামনে তার তৃতীয় টার্গেট – ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানো। ইমরান ফিরে আসায় পাকিস্তান দলের শক্তি শতকরা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেল। খেলা ছাড়ার পর আমার তো ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, ইমরান কিন্তু দুই মাসে নিজেকে আরও ঝরঝরে এবং ফিট করে তুলেছে। এই ফিটনেস-ফ্যানাটিক আগের মতই পারফরমেন্স দেখাবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট উইকেটে মার্শাল প্যাটারসনের বিরুদ্ধে ইমরান আক্রমণ – কি রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধই না অপেক্ষা করছে। তাজা সবুজ উইকেট, বল হাতে ছুটে আসছে ইমরান খান,..... আহা, কি মধুর দৃশ্য!



ইংরেজ নির্বাচকরা তখন আতঙ্কে ভুগছিলেন। বিধ্বংসী ফাস্ট বোলিং জুটি লিন্ডওয়াল এবং মিলার ইংল্যান্ডের ব্যাটিংকে চুরমার করে দিচ্ছেন। ক্রাচহীন খোঁড়া লোকের মতই তখন ইংল্যান্ড দলের অবস্থা। রুগীর জন্য চিকিৎসক যে ওষুধ দিয়েছেন, তা কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না – একজন যোগ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান। নির্বাচকরা মাথা ঘামিয়ে কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু হঠাৎই একজন নির্বাচকের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সহ-নির্বাচককে তিনি বললেন, 'সিরিল (ওয়াশব্রুক), দয়া করে এক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে যাবে? ঠিক ষাট সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা তোমাকে ডেকে নেব। আমাদের ওপর ভরসা রাখ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা এমন কিছু করব না, যা তোমার অথবা ইংল্যান্ডের ভাবমূর্তির ক্ষতি করতে পারে। বিস্ময়ে হতবাক ওয়াশব্রুককে ঘরের বাইরে যেতে হয়। এক মিনিট হওয়ার আগেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি জানতেন না, কী চরম বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি ঘরে ঢুকতেই ঘোষিত হল কণ্ঠস্বর: 'সিরিল, (সামান্য নাটকীয় বিরতির পর) পরের টেস্টে তুমিই ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরু করছ। এটাই আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ইংল্যান্ড তোমাকেই চায়। দলে তোমাকে ভীষণ দরকার।'

অবসরের পর ওয়াশব্রুকের আবার ইংল্যান্ড দলে ফিরে আসার এই হল নেপথ্যকাহিনী। প্রত্যাবর্তনেই তিনি খেলেছিলেন ৯৮ রানের দুর্ধর্ষ, অবিশ্বাস্য ইনিংস। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন। এরপর অনেক প্রত্যাবর্তনই ঘটেছে। কয়েকটি রীতিমত গৌরবোজ্জ্বল। দুটি জ্বলন্ত উদাহরণ – স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এবং ববি সিম্পসন। এখন প্রশ্ন এটাই: কেন ঘটে এই প্রত্যাবর্তন? তা কি সত্যিই একান্ত জরুরী? আসলে প্রত্যাবর্তনের কারণ দুটি। এক, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেশের জরুরী ডাক। উদাহরণ – সিরিক ওয়াশব্রুকই, এবং দুই, দীর্ঘ সময়ের জন্য ডাক। যেমন – স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, ববি সিম্পসন (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দীর্ঘায়িত হওয়ার দরকার হয়নি, কারণ প্যাকার সিরিজের ক্রিকেটারদের ওপর থেকে দ্রুতই নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছিল)। কিন্তু, এসব কি সত্যিই খুব জরুরী? হ্যাঁ, কখনও কখনও নিশ্চিতভাবেই জরুরী। এটা মাঝেমধ্যে অলৌকিক কাজ করে, যেমন ওরেলের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। গারফিল্ড সোবার্স, রোহন কানহাই, ওয়েসলি হল, ল্যান্স গিবসদের মত অসাধারণ নক্ষত্রদের তিনিই প্রথম উপহার দিয়েছিলেন



ওরেলের ভূমিকা পালন করবে ইমরান

• গোপাল বসু •

ধ্বংসাত্মক যন্ত্রটি, যা পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সোবার্স, কানহাই, লয়েডরা। এবং এখন ভিভিয়ান রিচার্ডস। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের পতাকাটা যদি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল নিজের হাতে তুলে না নিতেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পরিণত হত একঝাঁক প্রতিভাবান নক্ষত্রের

> **ব্যর্থতা যদি আসেই বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, ইমরান পাশেই থাকবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ভুল-ত্রুটি, বলে দেবে ঠিক কী করতে হবে। সাফল্যের জন্য এটাই সবচেয়ে জরুরী।**

সমষ্টিতে, যারা অসাধারণ ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে বিশ্বাসী, দলগত নয়। যাদের উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া, জেতা নয়। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে ওরেলের ভূমিকা অসামান্যই। ক্রিকেটার হিসাবে এমন কিছু নয়, কিন্তু নেতা হিসাবে? তিনিই তৈরি করেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

প্রত্যাবর্তনের শেষ উদাহরণ ইমরান খান। সে স্যার ওরেলের ভূমিকাই পালন করবে। তবে, এটা স্বীকার না করে উপায় নেই, একটা বড়সড় তফাতও আছে। ওরেল যখন ফিরে এসেছিলেন, নিজের সেরা সময় পেছনেই ফেলে এসেছিলেন। কিন্তু ইমরান খান? এখনও বিরাজ করছে দল তার স্বর্ণচূড়ায়? অধিনায়ক হিসাবে তার ভূমিকা যত বড়ই হোক, ক্রিকেটার হিসাবে অবদান নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম হবে।

আগে বলা হত সবচেয়ে কঠিন সফর ইংল্যান্ডের মাটিতেই। এখন আর তা নেই। সবচেয়ে কঠিন নিশ্চয়ই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। তাদের মাটিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জয় করার জন্য এটাই দরকার – পাকিস্তানের অন্যদের অনভিজ্ঞতার সংগে ইমরানের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ। পাকিস্তানের নির্বাচকরা ভাল করেই জানেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজে এমন পিচ কোথাও পাওয়া যাবে না, যা এক ইঞ্চিও টার্ন উপহার দেবে। সুতরাং পাকিস্তানের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচউইনার আব্দুল কাদিরের এবার কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। পাকিস্তান যদি সিরিজ জিততে চায়, পেস আক্রমণের ওপরই, প্রধানত ইমরান আর আক্রামের ওপরই নির্ভর করতে হবে। আক্রামেরও ম্যাচউইনার হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে নিজের এই ক্ষমতাটুকু অনুধাবন করতে পারল না। এবং এখানেই আসবে ইমরানের অভিভাবকত্ব ও অভিজ্ঞতা। কীভাবে? একজন ব্যাটসম্যানের মত একজন বোলারকেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আবহাওয়া, পরিবেশ ইমরানের অধিকাংশ সহযোদ্ধার কাছেই নতুন, যদিও তা ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার মত খামখেয়ালী নয়। পাকিস্তান দলে তরুণ ব্যাটসম্যানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রামিজ রাজা, সেলিম মালিক, শোয়াইব মহম্মদ, ইজাজ আমেদ----। ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজই বাকি। বিশ্ব ক্রিকেট সার্কিট ইমরান সম্পূর্ণ করে ফেলছে। এই তরুণদের দলটি সফল হবে কি হবে না, সে ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নেই, তা কেউই দিতে পারে না। ব্যর্থতা যদি থেকেই বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, ইমরান পাশেই থাকবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ভুলত্রুটি, বলে দেবে ঠিক কী করতে হবে এবং কী করা উচিত নয়। সাফল্যের জন্য এটাই সবচেয়ে জরুরী, এটাই চাবিকাঠি। চাবিটা পাওয়া গেলে তালা খুলে ফেলা কি খুব কঠিন?

তিন মাস পর সিধুর আত্মপ্রকাশ



দেবাশিস দত্ত

‘ঐ গুজবগুলোর জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আপাতত আমারই কাঁধে’

রিলায়েন্স কাপে ভারত অপ্রত্যাশিতভাবে সেমিফাইনালে উঠতে না পারলেও, অপ্রত্যাশিত-ভাবে ভারত একজন তারকাকে পেয়ে গিয়েছিল – নবজ্যোৎ সিং সিধু। দিল্লিতে কন্ডিশনিং ক্যাম্প চলাকালীন খবর পেয়ে গিয়েছিলাম যে কপিলদেব নরজ্যোৎ সিধুকে দলে

‘ডাঃ আলি ইরানী পরে আমাকে সব শুনে বলেছে যে প্লাস্টারে এক মাসের জন্য রাখা ঠিক হয়নি। দশ থেকে বারো দিন প্লাস্টার অবস্থায় খেলা উচিত ছিল। এবং তাহলে আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে শেষের দিকে কয়েকটি ম্যাচ খেলতেও পারতাম।’

রাখবেনই। পরে, ক্যাম্প যখন ক্রমশ শেষের দিকে এগিয়েছে, তখন ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে শুধু কপিলদেব নয়, সব নির্বাচকরাই সিধুকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। সুতরাং বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটপ্রেমীরা সিধুকে তখন দলে নেওয়ার ব্যাপারটা খুব ভাল চোখে দেখেন নি। কারণ, অরুণলাল চোদ্দজনের দলে ছিলেন না। যেহেতু, সিধুকে ক্রিকেটপ্রেমিকরা ওপেনার হিসাবে চিনতেন, তাই, সবাই ধরে নিয়েছিলেন, সিধুর জন্যই অরুণলাল বাদ গিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে কী হয়েছিল, শ্রীকান্ত এবং গাভাসকার ইনিংস ওপেন করেছিলেন। সিধু এসেছিলেন তিন নম্বরে।

তারপর, কী হয়েছিল, তা আজ ইতিহাস। রিলায়েন্স কাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই ঝলসে উঠেছিল সিধুর ব্যাট। প্রথম ম্যাচ থেকেই সিধু প্রমাণ করতে শুরু করেছিলেন যে এবার তিনি পাকাপাকিভাবেই টীমে থাকতে আসছেন। ঐ ছিপছিপে শরীর এবং ওঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখে বিস্মিত জিওফ্রে বয়কট বলেছিলেন, ‘আনবিলিভেবল! এই শরীরে এত শক্তি! সাবলীল ভঙ্গিমায় ছেলেটি প্রত্যেকটি শট নিল। এবং প্রতিটি শটেই ছিল অসম্ভব পাওয়ার।’

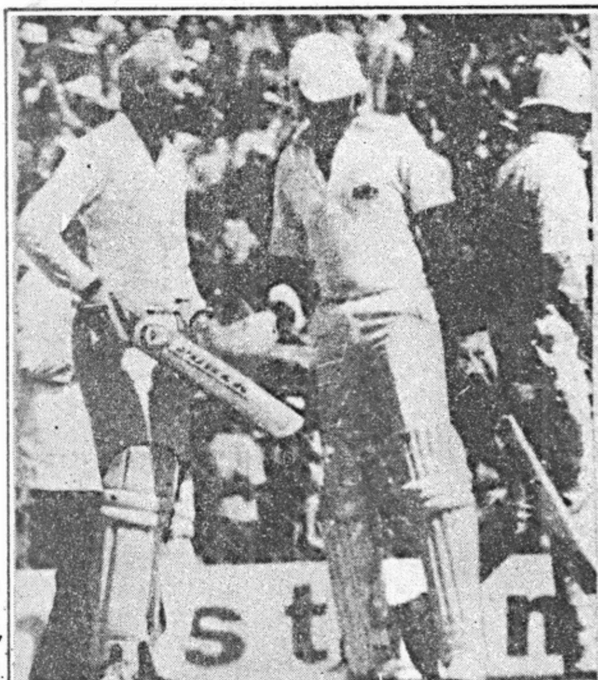
অথচ এহেন সিধু রিলায়েন্স কাপের পরই হঠাৎ উধাও হয়ে যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনি একটি ম্যাচেও খেলেননি।। ফলে, গুজব ছড়ালো – সিধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফার্স্ট বোলারদের খেলতে ভয় পাচ্ছেন। এবং বিয়ে করে তিনি নাকি কাশ্মীরে হনিমুন করতে গেছেন। কেউই কিন্তু ওঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারছিলেন না। অবশেষে মহিন্দার অমরনাথ আমাকে বলেছিলেন যে সিধু ৩১ জানুয়ারি নেহরু শতবার্ষিকী ম্যাচে খেলবেন। সেদিনই রাতে ওবেরয় হোটেলের একতিরিশ তলার বারো নম্বর ঘরে সিধুকে পেয়ে যাই। সেদিনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনি ২৫ রানের একটি সংক্ষিপ্ত, আক্রমণাত্মক এবং উপভোগ্য ইনিংস খেলেছিলেন। দেখে মনে হল, তবুও তিনি যথেষ্ট টেনশনে আক্রান্ত। তাই প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ৫ নভেম্বর রাতে এই বোম্বাইয়েই, তাজ মহল হোটেলে। আজ আবার দেখা সাতাশি দিন পরে। এই কদিনে আপনি ঠিক কীভাবে দিন কাটিয়েছেন।’

সিধু: এমন একটি প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ। কারণ, এমন অনেক কথাই বাকি আছে যা আমি সবাইকে জানাতে চাই। ৬ নভেম্বর সকালে আমি বোম্বাই থেকে দিল্লি হয়ে পাতিয়ালা পৌঁছই। ১০ নভেম্বর বিয়ে করি। আমার বাবা নেই, মা নেই। নেই কোন ভাই বোন। এতদিন একা থাকতাম, ফলে ভাল লাগতনা।’

‘তাহলে হনিমুনের জন্য কাশ্মীর যাওয়ার ঘটনাটি সত্য?’

সিধু: অফকোর্স নট। আমি বিয়ে করেছি ঠিকই। তবে, হনিমুনে কোথাও যাইনি। এবং যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে হনিমুনের জন্য আমি কোথাও গিয়েছিলাম

ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়



দিল্লিতে রিলায়েন্স কাপে বেংগসরকারের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন সিধু।

তাহলে, কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন ক্রিকেট খেলবোনা।

● আপনার চোট লাগল কীভাবে?

সিধু: ১৮ নভেম্বর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলাম। গুড লেংথ থেকে একটা বল লাফিয়ে হাতে লেগেছিল। বুড়ো আঙুলের জয়েন্টে

‘১৮ নভেম্বর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলাম। গুড লেংথ থেকে একটা বল লাফিয়ে হাতে লেগেছিল। বুড়ো আঙুলের জয়েন্টে চোট। প্লাস্টার করে দিয়েছিলেন স্থানীয় ডাক্তার এম ডি আগরওয়াল। আমার প্লাস্টার কাটা হয়েছিল, এক মাস তিন দিন পর।’

চোট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাতে প্লাস্টার করে দিয়েছিলেন স্থানীয় ডাক্তার এম ডি আগরওয়াল। আমার প্লাস্টার কাটা হয়েছিল এক মাস তিন দিন পর।

● তারিখটা মনে করতে পারেন?

সিধু ২১ ডিসেম্বর। এর মানে ভাইরাস ইনফেকশন হয়। ফলে এক চরম দুঃসময়েরমধ্যে দিয়ে আমার দিন কেটেছে। এত দুর্বল লাগছিল যে মাথা তুলে বসতে পর্যন্ত পারছিলাম না। তার উপর আঙুলের চোটের জন্য যন্ত্রণা তো ছিলই।

● প্লাস্টার কাটার পর কী করলেন?

সিধু: ডাঃ আলি ইরানী পরে আমাকে সব শুনে বলেছে যে প্লাস্টার এক মাসের জন্য রাখা ঠিক হয়নি। দশ থেকে বারো দিন প্লাস্টার রাখা উচিত ছিল। এবং তাহলে আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে শেষের দিকে কয়েকটি ম্যাচ খেলতেও পারতাম।

প্লাস্টার কাটার পর দেখলাম, আঙুল সোজা হয়ে থাকছে সব সময়। কিছুতেই আঙুল নড়াতে পারছিলাম না। তবুও আমি স্থানীয় মাঠে ব্যাট হাতে নেমেছিলাম। কিন্তু, কী বলব, ডিউস বল ব্যাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে গোটা হাতে যেন বিদ্যুৎ লেগে গিয়েছিল। ইলেকট্রিকের মত যন্ত্রণা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যাট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কয়েক দিন পরে, আবার চেষ্টা করেছিলাম ব্যাট হাতে দাঁড়াতে। পারিনি, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। কোন উপায়ে যা দেখে পাতিয়ালার এন আই এস-এ ডাঃ মাথুরের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কিছু এক্সার-সাইজ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেইমত বাড়িতে এক্সারসাইজ করেছিলাম। দ্রুত সেরে ওঠার জন্য বোম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ডাঃ আনন্দ যোশীর কাছে গিয়েছিলাম। এরই মাঝে আবার বুকে ইনফেকশন হয়েছিল। আমি বোম্বাই গিয়ে ব্লাড টেস্ট করিয়েছিলাম। একই সঙ্গে মেডি-কেল চেক আপ করিয়ে নিয়েছিলাম।

এই ম্যাচটা খেলতে না পারলে আমার আর ক্রিকেট মাঠে ফিরে আসা হত না.....আচ্ছা একজন অসুস্থ ক্রিকেটারকে কীভাবে ওঁরা মাঠে লড়াই করার নির্দেশ দেন?

● কিন্তু আপনার এই শারিরীক অবস্থার কথা নির্বাচব বোর্ড কর্মকর্তা বা জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের জানান নি কেন?

সিধু: সফরের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লিতে। এবং ঐ দিল্লি টেস্ট চলাকালীনই সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান বাপু নাদকার্নি আমাকে টেলিফোন করে আমার শারিরীক অবস্থার কথা জানতে চেয়েছিলেন। আমার কাছ থেকে সব শোনার পর তিনি বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ। এবং সুস্থ হওয়ার পর বোর্ডকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে যোগাযোগ কর।' আমি ঠিক তাই করেছিলাম। ১৫ জানুয়ারি আমি ফিটনেস সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পর বোর্ড সচিব রণবীর সিংয়ের সঙ্গে প্রথমে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। পরে, ওঁর নির্দেশ অনুযায়ী দিল্লিতে ওঁর বাড়িতে নিজে গিয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট জমা দিয়ে এসেছি।

● তাহলে তো আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠা ভিত্তিহীন যে আপনি প্যাটারসন অ্যান্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে ব্যাট করতে চাননি।

সিধু: ক্রিকেট ইজ মাই লাইফ। নবজ্যোৎ সিধু কোন বোলারকেই ভয় পায় না। এখন সিরিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এমন কথা বলছি বলে অনেকেই হয়ত পিছনে হাসবেন। কিন্তু, অভিযোগে আক্রান্ত আসামী যেমন আদালতে কিছু বলার সুযোগ পায়, আশা করি, আমাকেও সে সুযোগ দেওয়া হবে। আশা করি, এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন যে ম্যালকম মার্শাল প্যাটারসনের চেয়ে শুধু দ্রুতগামী নয়, ভয়ঙ্করও বেশি। এবং তিরাশিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলার কারা ছিলেন তা নিশ্চয় কেউ ভুলে যাননি। ম্যালকম মার্শাল, মাইকেল হোল্ডিং, অ্যান্ডি রবার্টস ব্যাপটিস্ট, ডেভিস এবং ওয়েন ড্যানিয়েল। আমি সেবার এই বোলারদের বিপক্ষে অমৃতসরে উত্তরাঞ্চলের হয়ে ১২২ এবং নাগপুরের সবুজ উইকেটে বোর্ড সভাপতি একাদশের হয়ে ৬০ রানের বেশি একটি ইনিংস খেলেছিলাম। সুতরাং, পেস বোলারদের বিরুদ্ধে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রে অন্তত প্রযোজ্য নয়।

আসল ব্যাপার কী জানেন, সময়টা ভাল যাচ্ছে না। তা নাহলে, আড়াই মাস ধারাবাহিকভাবে কেউ ভোগে। এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার যে আমি সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দেশে ফিরে গেল। আমার বাবা মারা যাওয়ার আগে বার বার বলে গিয়েছিলেন যে আমি যেন আবার জাতীয় দলে ফিরে আসতে পারি। ক্রিকেট ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তাহলে, ক্রিকেট মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? বাবার ইচ্ছে পূরণ করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

● তাহলে সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এই ম্যাচটার গুরুত্ব অনেক.....

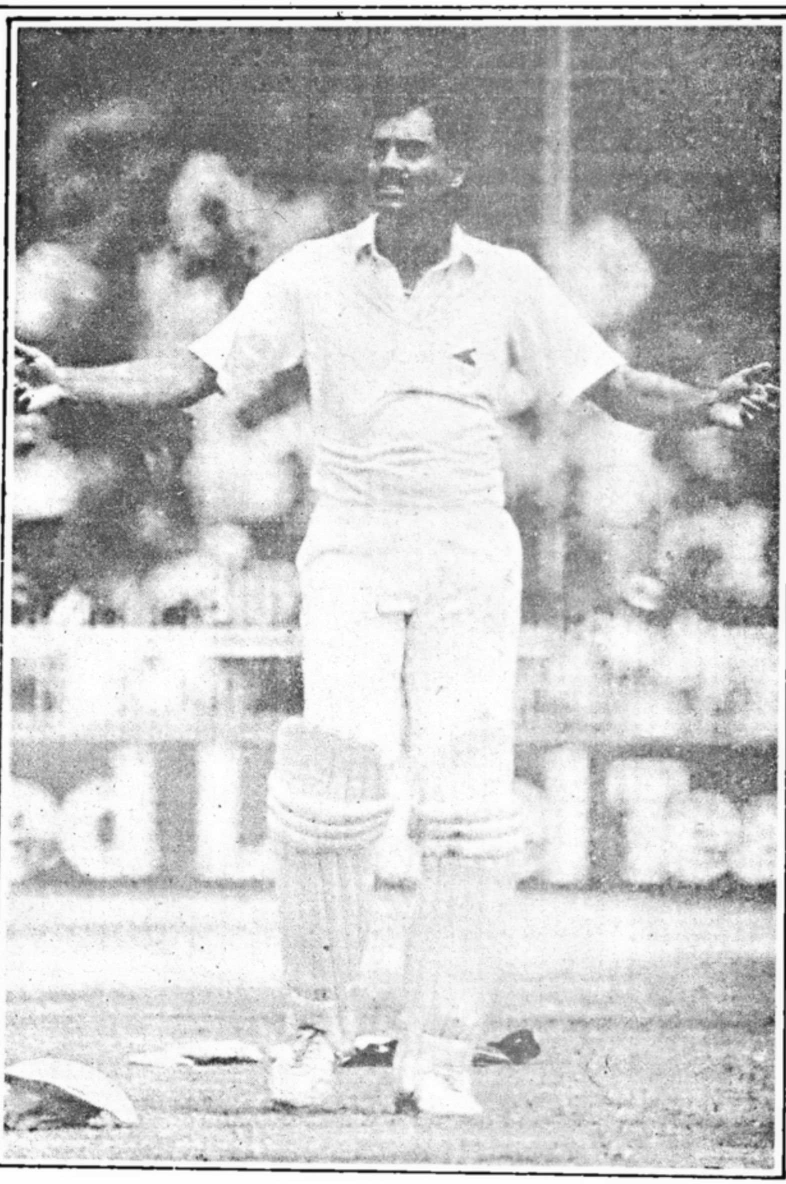
সিধু: অফ কোর্স। গত ২৫ জানুয়ারি মহিন্দার অমরনাথ টেলিফোনে আমাকে এই ম্যাচ খেলার কথা বলতেই আমি রাজি হয়ে গিয়ে-ছিলাম। এই দেখুন, আমার আঙুলে এখনও ফোলা রয়েছে। কিন্তু, আমি জানতাম এই ম্যাচটা খেলতে না পারলে আমার হয়ত আর ক্রিকেট মাঠে ফিরে আসা হত না। এখন, আমি সুস্থ। আশা করি, ঢাকার এশীয় কাপের জন্য নির্বাচকরা আমার কথা ভাববেন। বোম্বাই এসে আরও অনেক গুজব শুনলাম। পাঞ্জাবে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ওদিন আমাকে খেলতে বারণ করেছিলেন।

● গুজবটা কী?

সিধু: গুজবটাত্রেবললাম। গুজবের কারণ হল এই যে পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা নাকি চাননি আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হোক। অর্থাৎ রিলায়েন্স কাপের সাফল্যোই পা, আমি যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলতাম, তাহলে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাকি প্রবল ছিল। এবং তখন ঐ ভাবমূর্তি..... আচ্ছা, একজন অসুস্থ ক্রিকেটারকে কীভাবে ওঁরা মাঠে লড়াই করার নির্দেশ দেবেন? একটা বিরাট দুঃসময়ের সঙ্গে প্রায় আড়াই মাস সময় কাটল। আশা করি, দুঃসময় অচিরেই কেটে যাবে। তবে, ঐ গুজবগুলোর জবাব দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমার কাঁধে আপাতত থেকে গেল। ফ্রিজ ওয়েট অ্যান্ড সি।



অনবদ্য সিধু। ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়



দিলীপ তো শাস্তি পেল, কর্মকর্তাদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে ?

গোপাল বসু

সালটা, ১৯৭২ অথবা ১৯৭৩, ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও পেসারদের জন্য একটা সর্বভারতীয় শিবির হয়েছিল। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের মধ্যে আমিও ছিলাম। শিবিরটা হয়েছিল জুন মাসে। কোথায় হয়েছিল অনুমান করতে পারেন ? আপনারা বিশ্বাস করবেন .না হয়ত, শিবির হয়েছিল পাতিয়ালায়, যেখানের তাপমাত্রা ছিল ১১০^0 ফারেনহাইটের ওপর এবং অসম্ভব গরমের জন্য একমাসের কেন, একদিনের অনুশীলনও সম্ভব ছিল না।

পাঠক, আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ঐ সময় বোর্ডের কোনও সভা হলে, তা হত উটি অথবা কাশ্মীর অথবা কুলু-মানালি কিংবা সিমলা বা নৈনিতালে কিংবা একই ধরনের কোনও জায়গায়। সবচেয়ে বড় কথা হল, সভাটা অবশ্যই পাঁচতারা হোটেলের আরাম ও উজ্জ্বল্যেই হত। পাঠক, তখন বোর্ড কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্কটা ছিল অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের মত (কর্মকর্তারা যা চাইতেন তাই হত)। দুপক্ষের অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক বৈষম্যই এর মূল কারণ। – এইভাবেই হয়ত চলত। কিন্তু, অসম্মান থেকে ক্রিকেটারদের উদ্ধার করার জন্য নাইটের ভূমিকায় একজন অবতীর্ণ হলেন, যাতে উদ্বেল তাঁর, নাম কেরি প্যাকার। ক্রিকেটবিশ্বকে কিনে নেওয়ার পক্ষে কোটিপতি এই টিভি ব্যবসায়ীটি একাই যথেষ্ট ছিলেন।

চ্যানেল-৯ ক্রিকেট প্রচারের সর্বস্বত্ব না পাওয়ায় প্যাকার ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের মুখে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছিলেন, তাদের বিষদাঁত বেড়িয়ে পড়েছিল। এবং প্যাকার তাতে সফল হয়েছিলেন রুক্ষ ও তেজী অস্ট্রেলিয়ান ব্যক্তিত্বের সাহায্যে। সারা বিশ্বের ক্রিকেট কর্মকর্তারা শুধু এই কারণেই কোনদিন প্যাকারকে ভুলবে না। প্যাকার ক্রিকেটারদের বলেছিলেন যে, সংস্থাগুলো টেস্ট থেকে বিপুল লাভ করছে, সোনার পাত্র নির্মাণ করছে তা ক্রিকেটারদের জন্যই হচ্ছে, কর্মকর্তাদের জন্য নয়। প্যাকার ক্রিকেটারদের সচেতন করেছিলেন তাদের প্রাপ্য সম্পর্কে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল প্যাকার ক্রিকেটারদের বুঝিয়েছিলেন খেলে ভবিষ্যৎ তৈরি করা যায়, যথেষ্ট রোজগার করা সম্ভব।

টিভি-তে প্রচারের সর্বস্বত্ব পাওয়ার পর প্যাকার সমস্ত দেশের ক্রিকেটারদের ছেড়ে দেন। তার মাঝে ক্রিকেটারদের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়, প্রত্যেকেই অনেক সচেতন হয়ে পড়ে এবং দেশে ফিরে বোর্ডের কাছ থেকে তারা আরও আরও অর্থ দাবি করতে শুরু করে এবং বোর্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলি মানতে বাধ্য হয়। কারণ, তাছাড়া কোনও উপায় ছিল না। বোর্ড ভালভাবেই জানত, ক্রিকেটাররা স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংস, তাদের প্রাপ্য কঠোর হয়ে কেড়ে নেওয়া যাবে না। কিন্তু, বোর্ড বুঝতে পেরেছিল ক্রিকেটাররা এতে শুধু অর্থনৈতিকভাবেই স্বাধীন হচ্ছে না, বোর্ডের কাছ থেকেও মুক্ত হচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছিল ক্রিকেটারদের ওপর থেকে বোর্ডের কর্তৃত্ব কমতে যাচ্ছে, কর্মকর্তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য বোর্ডের পক্ষে তা মানা সম্ভব ছিল না।

ইতিমধ্যে, কিছু একদিনের প্রতিযোগিতা ও দু-একটি টেস্ট সিরিজ জিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত ভাল ফল করতে শুরু করে। ক্রিকেটারদের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ে কর্মকর্তারা দুটি কাজ করতে পারে। এক, ক্রিকেটারদের গৌরবের প্রতিফলিত ছটায় অবগাহন ও দুই, নীরব যন্ত্রণায় ভোগা। কর্মকর্তারা দুটিই করলেন।

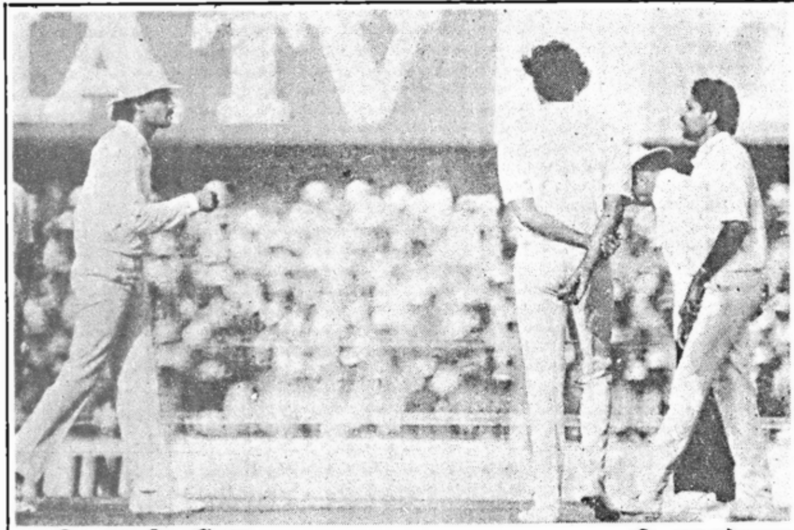
১৯৮৭ বিশ্বকাপে প্রতিটি ভারতীয় নিশ্চিত না হলেও অন্তত আশা করেছিল যে, তিরাশির ফল সম্ভব

হতে পারে। হৃদয় এবং আশা দুটিই ভঙ্গ হয় সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায়। প্রতিটি ভারতীয় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং ক্রিকেটারদের জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাঁটা দেখা দেয়।

'লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত কর' এটা আমাদের বোর্ড কর্মকর্তাদের আপ্তবাক্য। এবং, এখন না হলে কখনই হবে না বুঝতে পেরে বোর্ড দ্রুত চুক্তিপত্রে ক্রিকেটারদের সই করানোর সিদ্ধান্ত নেয় (কার্যত জোর করেই) ক্রিকেটাররা তা করতে সম্মত হয়। বোর্ড ভাবল হয়ত পায়ে শিকল পরানো গেল। দিলীপ বেঙ্গসরকার কিন্তু চুক্তিতে বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও লেখাই পছন্দ করল। এখানে, চুক্তির কথাটা যদি ভুলে যাই এ প্রসঙ্গে বলার বা লেখার কিছু নেই। কারণ, ভিভ রিচার্ডস একই কাজ করেছে এবং তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। কিন্তু, ভিভের কাজটা দিলীপ করল চুক্তিপত্রে সই করার পর যা, বোর্ড এবং আইনের চোখে অপরাধ। এখানে বলা দরকার দিলীপ যে সব বিষয় নিয়ে লিখেছে, অনায়াসেই সেগুলি বছরের সবচেয়ে অনালোচিত বিষয়। আমি জানিনা, কজন পাঠক দিলীপের সিন্ডিকেটেড কলমগুলি পড়েছেন। দিলীপ অবশ্য, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী – সারা ভারতের পাঠকদের কাছে নিজের বক্তব্য পৌছে দিতে পারত যদি, যে সব সাংবাদিক ভারতজুড়ে টেস্ট কভার করে বেড়ায়, দিনের খেলার শেষে অধিনায়ক হিসেবে তাদের কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করত। লেখাতে তো একই জিনিস থাকত। তাহলে, দিলীপের লেখা নিয়ে সমস্যা হল কেন? – সমস্যার সূতো অনেক গভীরে ও জটিল। সেই চিরপুরাতন সমস্যা – বোর্ড কর্মকর্তারা সবসময়ই চায় ক্রিকেটারদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে। কর্মকর্তারা চায়, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা বজায় থাকুক। পক্ষান্তরে, ক্রিকেটাররা সঠিকভাবেই ঐ ধরনের বোঝাপড়ায় যেতে রাজি নয়।

মুখ বাঁচানোর জন্য বোর্ডের কড়া না হয়ে উপায় ছিল না। ফলে, দিলীপকে শাস্তি দিতেই হয় এবং আইনত বোর্ড শাস্তি দেওয়ার জায়গায় ছিল। কিন্তু, সামান্য অপরাধে দিলীপকে যে শাস্তি দেওয়া হল তা বেশ কড়াই। একজন ক্রিকেটার যদি দেশের বা ক্রিকেটের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত না করে (দিলীপ





সাম্প্রতিক কালের তিন অধিনায়ক।

ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়



বোর্ড সচিব রনবীর সিং ও শ্রী রমন

কোনটাই করেনি), তাকে খেলতে দেওয়া উচিত। দিলীপ এখনও চূড়ান্ত ফর্মে, এবং এ সময়ে ক্রিকেট থেকে ছমাস বহিষ্কার তার প্রচুর ক্ষতি করতে পারে। যখন প্রত্যেকেই এগিয়ে চলেছে, একজন পিছিয়ে পড়ল। ছমাসের বিশ্রামে ম্যাকেনরোর কী হয়েছিল মনে পড়ে? দিলীপ ফর্ম হারালে বোর্ডই দায়ী থাকবে এবং বোর্ডকে জবাবদিহি করতে হবে। বোর্ডের হর্তাকর্তাদের মনে রাখা উচিত, একজন কর্মকর্তার স্থান পূরণ করতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি খরচ হয় না। কিন্তু, দিলীপ বেঙ্গসরকারের অভাব পূরণ করা হবে কী করে? এতে হয়ত সারাজীবন কেটে যাবে এবং সেটাও হয়ত যথেষ্ট নয়।

কিন্তু, এবার প্রশ্ন (কর্মকর্তারা সাবধান হন) উঠবে, – কর্মকর্তারা দোষ করলে তাদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে?'

আমার প্রথম প্রশ্ন – গাভাসকারকে বাদ দেওয়ার মত জঘন্য অপরাধ করার পরও নির্বাচকদের সাসপেন্ড করা হয়নি কেন? পরিষ্কার উত্তর: একজন কর্মকর্তা সবসময় অন্য কর্মকর্তার পাশে থাকে।

আমেদাবাদের ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিনের ম্যাচটি সম্পর্কে কেন বোর্ড কোনও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি,----প্রথমে বলা হয় বেসরকারি, পরে সরকারি বলা হলেও তা সিরিজের আওতায় রাখা হয়নি। অবিশ্বাস্য হাস্যকর যুক্তি। কেন, এ ব্যাপারে দায়ী কর্মকর্তাদের সাসপেন্ড করা হল না? – উত্তর আগেরটারই মত।

অন্যান্য দেশের বোর্ডের সম্মতি না পাওয়া সত্ত্বেও, রিলায়েন্স কাপ ফাইনালের পর, চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের খেলার কথা ঘোষণা সম্ভব হল কী করে। কে দোষী তা খুঁজে বার করার জন্য বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করা হল না কেন? যদি হয়েই থাকে, কে সে এবং তাকে কী করা হয়েছে? – আবার কোনও উত্তর নেই।

পাকিস্তানী ও ভারতীয় ক্রিকেটার কলকাতায় এসে পাঁচতারা হোটেলে আরামদায়ক ছুটি কাটিয়ে না খেলে ফিরে গেল কেন? এর জন্য দায়ী কে? – কোনও উত্তর পাওয়া যাবে না, কারণ কর্মকর্তাদের প্রিয় উত্তর হল 'নো কমেন্টস'।

'নো কমেন্টস' অবশ্য দীর্ঘদিন কর্মকর্তাদের কাজে লাগবে না। কাগজে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে, ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সি এ বি-র 'তাজমহল' থেকে পাথর খসতে শুরু করেছে। পরিবর্তনের বাতাস বইতে শুরু করেছে। সাজানো প্রাসাদ মাটিতে ধসে পড়বে এবং ভগ্নাবশেষের তলায় চাপা পড়বে কর্মকর্তারা এবং মৃত্যুটা বেশ করুণই হবে।

এখন, এসবে কি কর্মকর্তারা বদলাবে? বলা হয়, গাধা ছাড়া ঈশ্বর-সৃষ্ট সমস্ত জীবেরই পরিবর্তন হয়। পাঠক, অপরিবর্তনীয় আর কিছুর কথা আপনারা কি জানেন? যদি না জানেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন।

অরুণলাল বাদ গেলেন কীভাবে? শ্রীকান্ত কেন সহ-অধিনায়ক?



দেবাশিস দত্ত

যুদ্ধটা হয়নি। তবে প্রেক্ষাপট তৈরি ছিল। এবং ভিলেন ইচ্ছে করলেই কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, হঠাৎই দিলীপ বেংগসরকার অহিংস নীতি অবলম্বন করায় ভারতীয় ক্রিকেটাররা তো বটেই, ভারতের সমগ্র ক্রিকেটমহল স্তম্ভিত হয়ে যায়। বেংগসরকার-কে যে ছয় মাসের জন্য শাস্তি বোর্ড দেবে এটা ক্রিকেটাররা ভাবেননি। এবং শাস্তি দেওয়ার পর বেংগসরকার যে এভাবে পিছু হটবেন – এটাও আবার ক্রিকেট-প্রেমিকরা ভাবেননি। কিন্তু কর্মকর্তারা জানতেন, যে ক্রিকেটাররা কিছুতেই একজোট হয়ে লড়াই করতে পারবে না। ৫ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে গারওয়ারে ক্লাব হাউসে ঐ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়ার আগে সব বোর্ড কর্মকর্তাই এক বাক্যে বলেছিলেন, 'আমরা জানি ক্রিকেটারদের শক্তি কতটা। ওদের জোট কিছুতেই দানা বাঁধতে পারবে না।'

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

৫ জানুয়ারি সকালে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করছিলেন বোম্বাইয়ের ক্রিকেটাররা। অধিনায়ক দিলীপ বেংগসরকার ছিল তত্ত্বাবধানে। তখন ঘড়িতে সকাল নটা। আর তিন ঘণ্টা পরে, বোর্ড কর্মকর্তারা মিলিত হবেন বেংগসরকারের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু, বেংগসরকারকে অদ্ভুত-ভাবে উদাসীন দেখলাম। তবে, তখন কথা বলে একবারও মনে হয়নি যে বেংগসরকার এতটা কঠিন শাস্তি আশা করছেন। বেংগসরকার জানতেন যে শাস্তি হবে। তবে, ছয় মাসের নির্বাসন নয়। বেংগসরকার তার ঘনিষ্ঠ বোর্ড কর্মকর্তাদের সংগে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। ওঁরাও, ওঁকে নাকি আশ্বস্ত করেছিলেন যে আর্থিক জরিমানা দিতে হবে। নির্বাসন নয়। অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারির সভায় বোর্ড কর্মকর্তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা দিলীপ বেংগসরকারের কাছে ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

সেই চিঠি

শুধু বেংগসরকার কেন, কোন ক্রিকেটারই কি ভাবতে পেরেছিল যে দিলীপ বেংগ-সরকারের উপর এত কঠিন শাস্তি নেমে আসবে? ভারতীয় ক্রিকেটারদের সংগে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ৩১ জানুয়ারি বোম্বাইয়ে নেহরু শতবার্ষিকী ম্যাচের শেষে। সেদিন ওঁদের সংগে কথা বলে একবারও মনে হয়নি যে ওঁরা বেংগসরকারের শাস্তির ব্যাপারটা আঁচ করছেন।

তাহলে, কেন ওঁরা সেদিনই গোপন সভায় বোর্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? কেন ওঁরা সাদা কাগজে সই করে একটি কাগজ বেংগসরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন? ক্রিকেটাররা এখন, যাই বলুক না কেন, এ ব্যাপারে অন্তত দুটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথমত, ওঁরা বোর্ডের সাম্প্রতিক আচরণে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, ওঁরা বিদ্রোহ করবেন – এমন সিদ্ধান্তের কথা ওঁরা আগাম জানিয়ে দিয়ে বোর্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।









এশীয় কাপ শাস্ত্রী অধিনায়ক

দিলীপ বেংগসরকার, আপাতত ছয় মাসের নির্বাসনে। এই পরিস্থিতিতে, এশীয় কাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রবি শাস্ত্রী। ৪ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে নির্বাচকরা চোদ্দ জনের জাতীয় দল নির্বাচন করেছেন। ঘোষিত দল: –

১) রবি শাস্ত্রী (অধিনায়ক)
২) কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত (সহ-অধিনায়ক)
৩) নবজ্যোৎ সিং সিধু
৪) মহিন্দার অমরনাথ
৫) মহম্মদ আজহারউদ্দিন
৬) ডব্লু ভি রমন
৭) কপিলদেব
৮) কিরণ মোরে
৯) মণিন্দার সিং
১০) চেতন শর্মা
১১) সঞ্জীব শর্মা
১২) অজয় শর্মা
১৩) চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত
১৪) আরশাদ আয়ুব






অনুরোধ

ছয় মাসের নির্বাসনের ফতোয়া জারি করার পর, ক্রিকেটাররা হতভম্ব হয়ে যান। ওঁরা ততদিনে নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। সবাই ভেবেছিলেন দিলীপ বেংগসরকার ঐ বিদ্রোহের চিঠি বোর্ড কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু, দিলীপ তা করেননি। হঠাৎই তিনি একা ব্যাক ফুটে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে এই লড়াইয়ের নেতা কপিলদেব এবং বোম্বাই থেকেই রবি শাস্ত্রী দিলীপ বেংগসরকারকে এরপরও ঐ বিদ্রোহের চিঠি বোর্ড কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু, বেংগসরকার, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, লড়াই থেকে পিছিয়ে আসাই শ্রেয় মনে করেন।



অতঃপর

রবি শাস্ত্রী, যিনি এক মাসের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি বোর্ডকে আর একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন যে তিনি সুস্থ। সুতরাং, রবি শাস্ত্রীকেই নির্বাচকরা অধিনায়ক হিসাবে বেছে নেন। অনেকেই মনে করছেন, রবি শাস্ত্রী, পরিস্থিতি অনুধাবন করেই বোর্ডকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন যে তিনি সুস্থ। তাঁরা কিন্তু এ ব্যাপারটা ভুলে গেছেন যে দিলীপ বেংগসরকারের অনুপস্থিতিতে তিনিই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেন। তাহলে, রবি-ই কি অধিনায়ক হিসাবে অটোমেটিক চয়েস নয়?

অরুণলাল বাদ

সিধু যে পুরোপুরি সুস্থ – এ ব্যাপারে বোর্ড কর্মকর্তা এবং নির্বাচকরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। ৩১ জানুয়ারি, বোম্বাইয়ে নেহরু শতবার্ষিকী ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সংক্ষিপ্ত, আক্রমণাত্মক এবং উপভোগ্য, ইনিংস খেলার পরই সিধু আবার সকলের মন জয় করে নেন। অন্যতম নির্বাচক রাজ সিং সেদিন মাঠে ছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি সভার শুরুতেই এ তথ্য উল্লেখ করতেই অন্য নির্বাচকরা সিধুর পক্ষে রায় দেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষের কয়েকটি একদিনের ম্যাচে অরুণলাল ব্যর্থ হন। ফলে রিলায়েন্স কাপের হিরো নবজ্যোৎ সিং সিধু অরুণলালকে সরিয়ে দলে আসেন। পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি রমেশ সাক্সেনা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

শেষ খবর

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কেন্দ্রীয় সরকার ১১ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে বোর্ড সচিব রণবীর সিংকে জানিয়ে দেয় যে এশীয় কাপে ভারত অংশগ্রহণ করবে না। এর আগে ছিয়াশিতেও ভারত শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এশীয় কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

চোদ্দজনের দলে ওঁকে রাখা যেত। সিনিয়ার ক্রিকেটার হিসাবে রিজার্ভ খেলোয়াড়দের বেঞ্চে বসে থাকার ব্যাপারটা নির্বাচকদের ভাল লাগেনি। তাই, ওঁরা অরুণলালকে দলের বাইরে রাখেন।



সহ-অধিনায়ক

সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমিকরা ভাবেনইনি যে কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক পদে মনোনীত হবেন। যেহেতু রবি আপাতত স্টপ-গ্যাপ অধিনায়ক, সেহেতু একজন অপেক্ষাকৃত জুনিয়ার ক্রিকেটার-কেই সহ-অধিনায়ক করার কথা ভাবেন নির্বাচকরা। মহিন্দার অমরনাথ দলের সবচেয়ে সিনিয়ার ক্রিকেটার। কিন্তু, তাঁকে দীর্ঘকালের জন্য অধিনায়ক করার ব্যাপারে কোন নির্বাচকই সায় দেননি। সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কপিলদেব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। সুতরাং বাকি একমাত্র শ্রীকান্ত যিনি প্রতিষ্ঠিত তারকাদের মধ্যে অন্যতম জুনিয়ার ক্রিকেটার।

এবং পণ্ডিত

সেই অদ্ভুত যুক্তি। রিলায়েন্স কাপে খেলতে আসা ছটি বিদেশী দলের একটিতেও দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক ছিল না। ছিল ভারতীয় টীমে – চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। এবারও তিনি সুযোগ পেলেন একই কারণে। ভারতীয় নির্বাচকরা তো ঝুঁকিতে বিশ্বাসী নয়। সুতরাং একজন স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান, একজন স্পেশালিস্ট বোলারের জায়গায় ওঁরা একজন স্পেশালিস্ট উইকেটরক্ষককে দলে রাখতে চেয়েছিলেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সেখানে আমি, আপনি কে?




এশীয় কাপঃ কবে ও কোথায়

দ্বিতীয় এশীয় কাপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে। চার দেশীয় এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে দুই প্রতিপক্ষ ভারত ও বাংলাদেশ। নীচে, এশীয় কাপের ক্রীড়াসূচী দেওয়া হল।

২২ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম বাংলাদেশ
(চট্টগ্রাম)
পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা
(ঢাকা)

২৪ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
(ঢাকা)
পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ
(চট্টগ্রাম)

২৫ ফেব্রুয়ারি
শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ
(ঢাকা)

২৬ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম পাকিস্তান
(ঢাকা)

২৮ ফেব্রুয়ারি
ফাইনাল (ঢাকা)



‘কারও পরিবর্ত হিসেবে নয়, নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য’

অরূপ বসু

‘কখনই তো ভাবিনি বড় মাপের ক্রিকেটার হব। একজন সফল ও দক্ষ ক্রিকেটার হওয়াটাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য, এরকম একটা ভাবনাও আমাকে কখনও তাড়া করেনি। তাই কী সাক্ষাৎকার দেব, এটা আগে ভেবে নিই, তবে তোমাকে বলব, অরূপ ভাইয়া অমুক সময়ে অমুক জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট রইল, ইন্টারভিউ দেব' গোয়ালিয়রে ভারতের সপ্তম একদিনের ম্যাচের আগে ভারতের খেলোয়াড়রা যখন অনুশীলন করছিলেন, তখন ভারতীয় ক্রিকেটে দিল্লির নতুন চ্যালেঞ্জ সঞ্জীব শর্মাকে ইন্টারভিউয়ের কথা বলতেই তিনি এই কথাগুলো বলে হাসতে শুরু করলেন। তারপর হিরওয়ানি এমন কি রমন লাম্বাকে দেখিয়ে বললেন,

'ওদের ইন্টারভিউ নিন। ওদের কেউ ধ্রুবতারা আবার কেউ মেঘে ঢাকা তারা – যেমন লাম্বা এই আছে – এই নেই। ঘুরে ফিরে আসছে। আমি তো কোন দলেই পড়ি না।' আবার হাসতে লাগলেন সঞ্জীব শর্মা। কয়েকওভার বল করে এসে নিজেই বললেন, 'সন্ধে বেলায় উষা কিরণ প্যালেসে আসছেন তো – আরে না, ইন্টারভিউ নয়, একটু আড্ডা মারা যাবে তো!' এইরকমই

প্রাণখোলা উচ্ছল আনন্দে টলমল, ভারতের নতুন পেস ব্যাটারি সঞ্জীব শর্মা। সন্ধে নয়, কাজ সেরে যেতে যেতে রাতই হয়ে গেল। তখন প্রায় নটা। পরদিন ম্যাচ। ডিনারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সঞ্জীব শর্মা, রুমমেট হিরওয়ানি মেনু চার্ট দেখছেন, উষা কিরণ প্যালেসের ১০ নম্বর ঘরে এই প্রতিবেদকের অনুপ্রবেশ ঘটল। হিরওয়ানিই সঞ্জীবকে বলল, 'সঞ্জু, দাদা আ গিয়া'। শুরু হল আড্ডা। ঘরের বাইরে হোটেলের ল'নে কনকনে শীতের মধ্যে তখন একা একা শারীরিক অনুশীলন করে চলেছেন ভিভ রিচার্ডস। কথা বলতে বলতে সঞ্জীব শর্মা জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন। ভিভের দিকে চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে আপন মনে বললেন, 'ওরা ক্রিকেটার, আমরাও ক্রিকেটার, এরপর আপনি আবার ইন্টারভিউ দিতে বলছেন। হ্যাঁ দেব, কাল খেলা শেষে এখানে আসুন। তখন তো আর জানালার ধারে, ঐ লনে ভিভ দৌড়বে না। এমন কথা বলে এই দৃশ্য দেখা থেকে আপাতত নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই না। হিরওয়ানি রুম হিটারটা জ্বালিয়ে দিল। বাইরে তখনও শীতের মধ্যে একা একা অনুশীলন করে চলেছেন ভিভ রিচার্ডস।

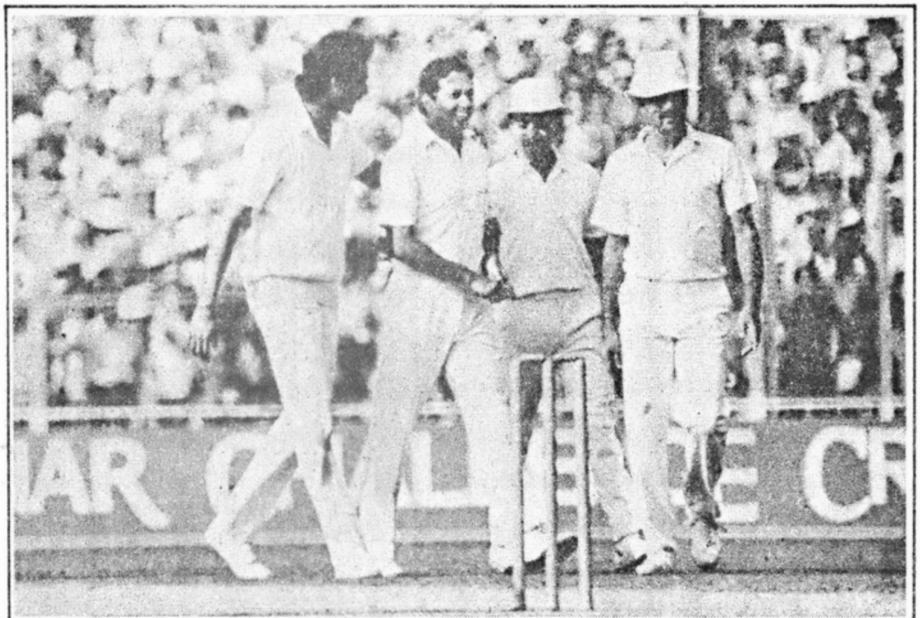
যেমন কথা ছিল, তার কিছু পরেই সঞ্জীব শর্মার সঙ্গে ১০ নম্বর ঘরে কথাবার্তা শুরু হল।

● তুমি কি সত্যি সত্যিই ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রিকেট নিয়ে কিছুই ভাব নি?

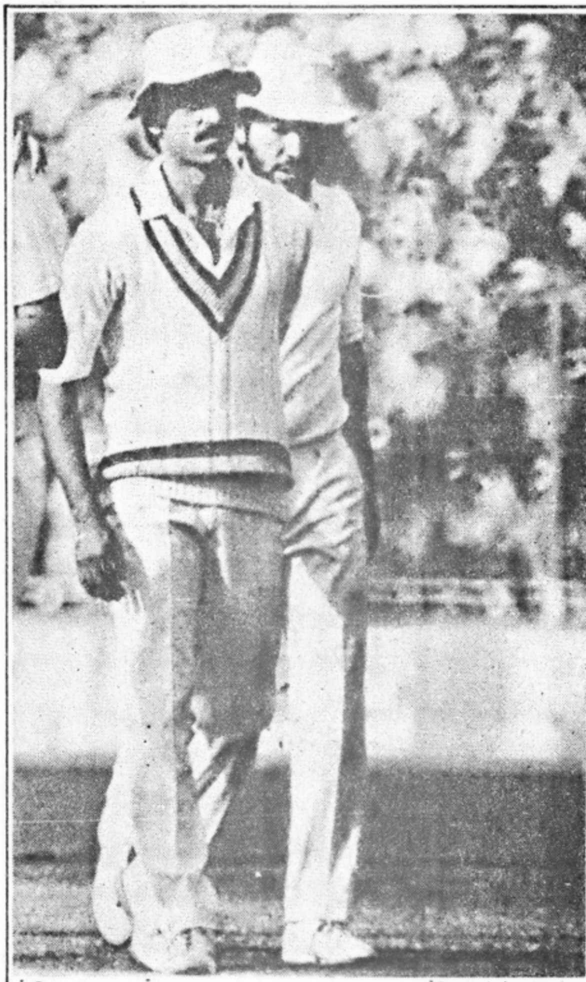
●● না বললাম তো। আর দশটা কিশোরের মত গলির ক্রিকেট খেলতাম। কখনও ক্রিকেট, কখনও ফুটবল, কখনও বাস্কেটবল খেলতাম আসলে সবই খেলার আনন্দে। সেই বয়স পর্যন্ত ফিরোজ শাহ কোটলাতে গিয়ে কোন বড় ম্যাচও দেখিনি।

● ষোল বছর বয়সে এসে তোমার ক্রিকেট জীবনে হঠাৎ ক্রিকেটের বাতাস লাগল কী করে?

●●● দিল্লির কে ভি এস স্কুলের ক্রিকেট টীমটা খুব ভাল। দিল্লির অনেক ক্রিকেটারের ক্রিকেট জীবন এখান থেকেই শুরু। একটা জিনিস দেখতাম, যারা ক্রিকেট খেলে, যারা এই স্কুল থেকেই ক্রিকেটার হয়ে



ইডেনে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে মহিন্দার উইকেট পাওয়ার পর রবি, সঞ্জীব ও শ্রীকান্ত   ছবি: এস এস কাঞ্জিলাল



সঞ্জীব শর্মা ও অরুণলাল   ছবি: এস এস কাঞ্জিলাল

পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাদের আলাদা গুরুত্ব আছে, স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে। একটা অনুষ্ঠানে স্কুল দলের ক্রিকেটাররা বিশেষ প্রবেশ পত্র পেল। আমি তো পেলাম না, বরং চেয়ে অপমানিত হলাম। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম, স্কুল দলের ক্রিকেট টীমে খেলবই। জেদের বশে ভালভাবে বেশ কয়েকদিন অনুশীলন করলাম এবং স্কুলের নির্বাচনী ক্যাম্পে ব্যাটে ও বলে বিশেষ সাফল্য পেয়ে স্কুল দলে ঢুকলাম। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম, চেষ্টা করলে, আমিও তো ভাল ক্রিকেট খেলতে পারি।

● তারপর?

●● ১৯৮১-৮২ সালে আমি এগার ক্লাসে পড়ি। ক্রিকেটে আমার নেশা ধরে গেছে। ধবধবে সাদা পোশাকের প্রতি একটা আলাদা মমতা জন্মে গেছে। নিয়মিত অনুশীলন করছি। ক্রিকেটের বিভিন্ন বই, বিশেষ করে পেস বোলারদের উত্থান পতনের নানা কাহিনী পড়ছি এবং অনুপ্রাণিত হচ্ছি। বুঝতে পারছি, ক্রিকেটের পোশাক আমার শরীর ও মনে ভাল করেই এঁটে বসছে। চেষ্টা করলেও এ পোশাককে আর খুলে রাখতে পারব না।

● স্কুল ক্রিকেটে উল্লেখ্য সাফল্য?

●● সাফল্যটা স্কুলের চেয়ে কলেজ জীবনে গিয়ে বেশি এসেছে। স্কুল জীবনে যে ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা জন্মাতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কলেজ জীবনের শুরু থেকেই তাই ক্রিকেটই আমার ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল। ১২ ক্লাস পাস করে ভর্তি হলাম, লাজমতি নগরের পি জি দেবী

কলেজে। কয়েকজন ক্রিকেট পাগল ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। কলেজে দারুণ পারফরমেন্সের সুবাদে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় দলে ঢুকে গেলাম। ১৯৮২, ১৯৮৩-তে দু-দুবার রোহিনটন বারিয়া কাপে অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য পুরস্কৃত হলাম।

● সাফল্যের স্বাদ তাহলে পেতে শুরু করেছ?

●● হ্যাঁ, ১৯৮৩-তে সি কে নাইডু ট্রফির ফাইনালে ৬২ রানে ৩ উইকেট পেলাম, ১৫৬ রানের (অপরাজিত) শতরান পেলাম। হ্যাঁ যে ফিরোজ শাহ কোটলাতে কখনও দর্শক হিসেবে ঢুকিনি, সেখানে ক্রিকেট জীবনের প্রথম বড় সাফল্য পেলাম। অতঃপর এই কোটলাতেই জীবনের রঞ্জি ম্যাচ খেললাম হরিয়ানার বিরুদ্ধে।

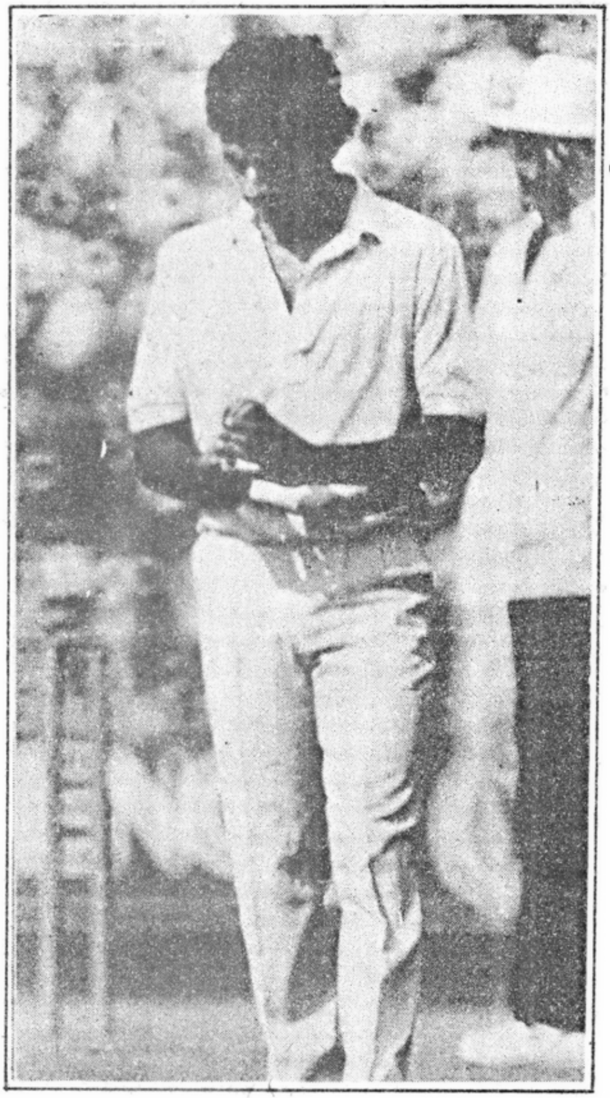
● এখন পর্যন্ত তোমার যে ক্রিকেট জীবনকে তুমি আয়নার সামনে তুলে ধরতে পার, তাকে বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে কোনটা তোমার ক্রিকেট জীবনের টার্নিং পয়েন্ট?

●● অত বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েই বলতে পারব। ১৯৮৪ সালে মোহননগরে মোহন মিকিনসের বিরুদ্ধে একটি আমন্ত্রণী ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম। সেই ম্যাচে আমার বোলিং-এ মোহনমিকিনসের অধিনায়ক মদনলাল খুশি হন। আমাকে বলেন, প্রচন্ড অনুশীলন করে যাও। তুমি একদিন ভারতীয় ক্রিকেটে একটি উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠতে পারবে। তারই কথায় পরের বছরই মোহনমিকিনসে যোগ দিই। উদ্দেশ্য একটাই মদনলালের মত ফাইটার ক্রিকেটারের সান্নিধ্যে থাকতে পারব, সব সময় তার পরামর্শ, গাইডেন্স পাব। সেটা পেয়েছিও। এরপরও কি বুঝিয়ে বলতে হবে আমার এ পর্যন্ত ক্রিকেট জীবনের টার্নিং পয়েন্ট কোনটা!

হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমাকে এই সময়ে কমল জুলেজাও দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। নানাভাবে সাহায্য করেছে।

● বলের পাশাপাশি ব্যাটিং-এর নজর দিচ্ছ কবে থেকে?

●● যেদিন থেকে ক্রিকেটকে ভালভাবে গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকেই দক্ষ অলরাউন্ডার হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। মোহনমিকিনসের কিছুদিন পর আমি জি জি দত্ত ক্লাবে যোগ দিই। আমাদের কোচ অপেক্ষাকৃতকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সব সময়ে আমাকে ওপরের দিকে ব্যাট করতে পাঠাতেন। তিনি বলেন, চেষ্টা কর, তোমার ব্যাটের হাত ভাল, মুসকিল হচ্ছে ব্যাটসম্যান হিসেবে তোমার নিজের ওপর আস্থা কম, যেটা বোলার হিসেবে তোমার মধ্যে আছে।



ছবি : এস এম কাজিলাল

সঞ্জীবের প্রিয়

প্রিয় রঙ	: ধূসর
প্রিয় মাঠ	: কলকাতা, ইডেন
প্রিয় অভিনেতা	: নাসিরুদ্দিন শাহ্
প্রিয় ফুটবলার	: মারাদোনা
প্রিয় খেলা	: টেবল টেনিস
প্রিয় গায়ক	: মাইকেল জ্যাকসন
প্রিয় ক্রিকেটার	: রিচার্ড হেডলি
প্রিয় বই	: ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট
প্রিয় গায়িকা	: লতা মঙ্গেশকর
প্রিয় খাদ্য	: চিকেন সামোসা
প্রিয় অবসর বিনোদন	: আড্ডা

● তোমার পরিবারে আর কেউ ক্রিকেটার আছে?

●● আমিই প্রথম ক্রিকেটার তবে তার জন্য কোন অসুবিধা হয় নি।

● একবারও যে টেস্ট খেলতে পার কিংবা একদিনের ম্যাচেও ভারতীয় দলে আসতে পার এটা কখনও বুঝতে পেরেছিলে?

●● রিলায়েন্স ক্যাম্পে ২৫ জনের ভারতীয় দলে আমি ছিলাম। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ। ভারতীয় দলে স্থান পাওয়াটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া স্থান পাওয়ার চেয়েও আমার বড় দুশ্চিন্তা, সুযোগ পেয়ে কতটা নিজেকে প্রমাণ করতে পারব তা নিয়ে। আমি এও জানি আরও অনেক তরুণ ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে, সামান্য সুযোগেই নির্বাচকরা আমাকে গলাধাক্কা দেবেন। কখনও তাই অস্থির হই নি। চন্ডীগড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার পরই বুঝে নিয়েছিলাম, এই সফরেই খেলব।

● কপিলদেব তোমাকে কীভাবে সাহায্য করেছেন?

●● একদিন দিল্লির বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে টিপস দিয়েছেন। আর বলেছেন, 'মনে রেখো আসল কথা হল অনুশীলন। অনুশীলন ছাড়া কোন কিছুই তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না।

● টেস্ট ও একদিনের ম্যাচে মানিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

●● হচ্ছে, খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে আজ একটা বড় সমস্যা, যেটা আগেকার ক্রিকেটারদের ছিল না। একটানা চারটি টেস্টের পর একটানা ৮টি একদিনের ম্যাচ খেলতে কিন্তু এতটা অসুবিধা হত না। এ ব্যাপারে ক্রিকেট কর্মকর্তাদের একটু ভাবা উচিত।

● তোমার জীবনের লক্ষ্য?

●● একঝাঁক ভাল ক্রিকেটারের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ভারতীয় দলে নিজের জায়গাটা পাকা করতে হবে। কারও পরিবর্ত হিসেবে নয়, নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য।

● সাতাশিটা তোমার কেমন কাটল?

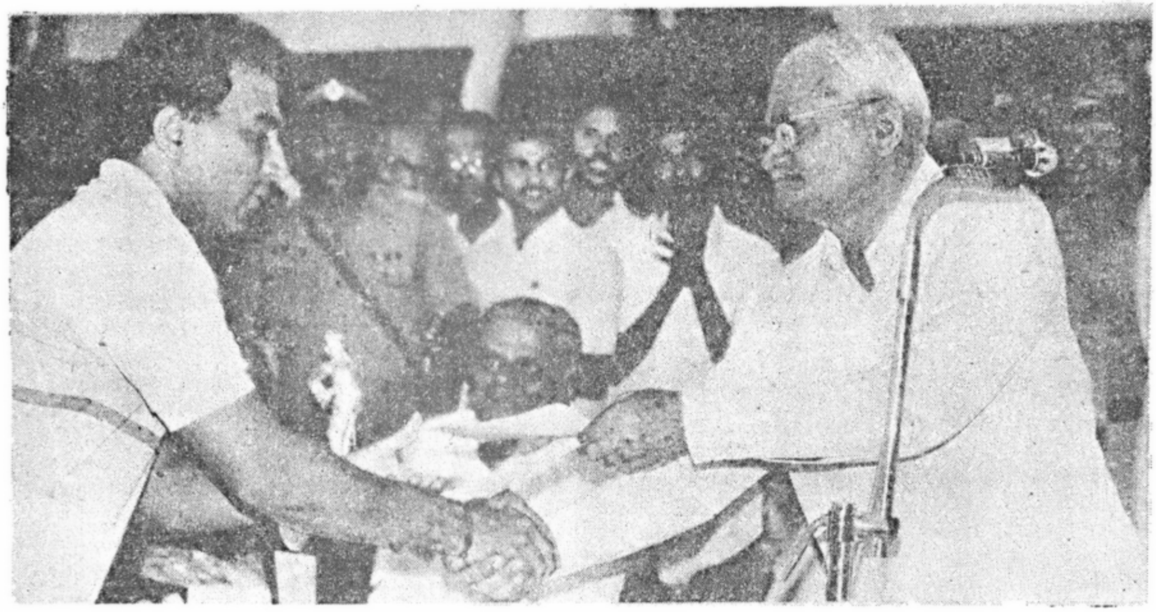
●● রঞ্জিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৫৮ রানে ৪ উইকেট এবং ৪২ রান করেছিলাম। রঞ্জিতে আমার ব্যাটিং গড় ১২১ এবং মোট উইকেট ১৬। চন্ডীগড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৭২ রান করেছিলাম।

● ছোটবেলায় তোমার প্রিয় ক্রিকেটার কে ছিলেন?

●● ঘাউড়ি। এখন কপিল। আর সব সময় মদনলাল।

ওয়াংখেড়ে: ডিফ্যাকটো ডারলিং

বোম্বাই থেকে মৃণালকান্তি সাহা



কাকতালীয় নয়, হয়ত বিধাতারই অমোঘ নির্দেশ। নেভীব্যানডে পূর্বরাতে বাজছিল He's a jolly good fellow। কান পেতে শুনছিলেন চারশ নির্বাচিত আতীথ, শুনছিলেন পঁচাত্তরের সর্বপ্রিয় মুখ শেষরাও কৃষ্ণরাও ওয়াংখেড়ে। সম্ভবত: এ ছিল শেষরাওয়ের শেষপায়ানীর সুর, আপামর মানুষের বিদায়-ভালবাসার অমল প্রতিধ্বনি। রুসি কারানজিয়ার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিনম্র প্রীতি-শ্রদ্ধার সুর শুনে অমল আতৃপ্ত মনেই গৃহকোণে ফিরেছিলেন ওয়াংখেড়ে। কিন্তু প্রভাতের তরুণ-আলোতে সূর্যকলঙ্ক, বোম্বাইয়ের মাঠের ঘাসে ঘাসে করুণ সুরের মূর্ছনা। ওয়াংখেড়ের স্টেডিয়ামের পালকপিতা হারিয়ে গেছেন, — হাসিমুখে, — স্বর্গলোকের স্টেডিয়ামে।

তিরিশে জানুয়ারি সকাল এগারটা পঁচিশ। স্টেডিয়ামের মাঝখান থেকে সাদা অ্যামবাসাডরের যাত্রা শুরু। বিজয় মার্চেন্ট স্ট্যানডের পাশের গেট দিয়ে রওনা হল অ্যাম্বুলেন্স। অনুসারী কারের ক্যারাভান। মেরিন ড্রাইভের সমুদ্রবাতাসে অবগাহন করতে করতে চিরতরে সেকেন্ডহোম বোম্বাই ছাড়লেন ওয়াংখেড়ে। গন্তব্যস্থল ফারসহোম। এরপর লাসটহোম চিরপ্রশান্তির নীড়ে। মনে আছে, ওয়াংখেড়ে সাহেবকে প্রথম দেখেছিলাম এই স্টেডিয়ামেরই মাঝখানে, মেয়েদের ক্রিকেট-আসরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। আবার এই স্টেডিয়ামের মাঝখান থেকেই দেখলাম ওঁর অন্তিমযাত্রা। প্রকৃতির সফেদকুন্ডলী।

মেধার পরিমাপে ওয়াংখেড়ের স্মৃতিবৃত্তের পরিধি অপরিসীম। জীবন সামিয়ানার সব অঞ্চলেই ওর অবাধ আচরণ। অসামান্য সরল-সত্যকে সরল-মুখেই বলতেন। মনে আছে, গত ইংল্যান্ড সফরের প্রাক্কালে পি জে হিন্দু জিমখানা মাঠে সুনীল গাভাসকারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলছিল। ওয়াংখেড়ের ভাষণে বেরিয়ে এল সরল হিতোপদেশ, — সুনীল, একটি কথা মনে রেখ, de jure অধিনায়ক যে-ই হোক না কেন, ভারতের de facto অধিনায়ক তুমি। হ্যাঁ, তুমিই ভারতের de facto অধিনায়ক। তুমি দলের সিনিয়ারমোস্ট খেলোয়াড়, তোমার কাছে দেশের ও দলের প্রত্যাশা অনেক। কপিলকে সবসময় সুপরামর্শ দেবে, দলকে সুপরিচালিত করবে।' সুনীলও সেদিন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি আমার ক্রিকেটবুদ্ধি ও উৎসাহ দিয়ে কপিল ও দলকে অনুপ্রাণিত করব। আশাকরি, সেই সময় আপনিও লন্ডনে থাকবেন এবং আমাদের সবার সাচ্ছন্দ্য ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখবেন।' ওয়াংখেড়ে হাসিমুখে সম্মতি দিলেন। সুনীলের অনুরোধের জবাব দিয়েছিলেন সফরকারী দলের ম্যানেজার রাজ সিং। তিনি বলেছিলেন, 'সুনীল, আমাদের কোন চিন্তা নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই মিস্টার ওয়াংখেড়ের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব আছে। আমাদের সফরকালে উনি ওখানে নিজের কাজে থাকছেন। কোন সমস্যা হলে ওঁর স্মরণ নিতে আপত্তি নেই।'

অন্ততপক্ষে ভারতীয় ক্রিকেটার-দের শেষ শরণ ছিলেন ওয়াংখেড়ে। ওদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ওয়াংখেড়ের অবদান ছিল অসামান্য। সেজন্য আজকের তরুণতম ক্রিকেটারটিও বলতেন, — de jure ডারলিং যেই হোক না কেন, ক্রিকেটারদের de facto ডারলিং স্যার আপনিই।

ওয়াংখেড়েকে 'বাবা' বলেই ডাকতাম: গাভাসকার

এস কে ওয়াংখেড়ের মৃত্যু ভারতীয় ক্রিকেটে একটা বড় রকমের ধাক্কা। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয় বোর্ডকর্তা, কারণ তিনি সব সময়ই আমাদের দাবির কথা মন দিয়ে শুনে তারপর ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর রসিকতাবোধ ছিল দারুণ। তিনি ছিলেন আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তাও। ক্রিকেটারদের কাছে তিনি ছিলেন বাবার মত। 'বাবা' বলেই আমরা অনেকেই তাঁকে ডাকতাম। এরপর যখন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখব, এক পেয়ালা গরম চা এগিয়ে দিয়ে বাবা হাসছেন না, খুবই খারাপ লাগবে। জীবনের ইনিংস একদিন শেষ হয়ই, বাবারও হয়েছে। একটু তাড়াতাড়িই ঘটল ব্যাপারটা।

ক্রিকেট ডায়েরী

দেবাশিস দত্ত

নাদকার্নির ভবিষ্যৎ

আমেদাবাদের একদিনের ম্যাচ যে আন-অফিসিয়াল ম্যাচ – একথা জানতেন শুধু পাঁচজন। শেষ পর্যন্ত আমেদাবাদে টস করার আগের মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ভিভিয়ান রিচার্ডস রবি শাস্ত্রীকে বলার পর আসল ব্যাপারটা বেরিয়ে আসে। কলকাতা টেস্ট ম্যাচের বিরতির দিন গ্র্যান্ড হোটেলে গভীর রাতে ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যানেজার জ্যাকি হেনড্রিক্সকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে আমেদাবাদের ম্যাচটি 'আনঅফিসিয়াল'। মৌলিকভাবে ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে ওঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরের পক্ষ থেকে যেন এ ব্যাপারটা ফাঁস করে না দেওয়া হয় ম্যাচের দিন সকাল পর্যন্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবির এই অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিল। কিন্তু, জানেন কি, যে চিঠিতে জ্যাকি হেনড্রিক্সকে আমেদাবাদের ম্যাচের স্ট্যাটাসের ব্যাপারে জানানো হয়েছিল তাতে সই করেছিল কে কে? অনেকেই জানেন না। বোর্ড সচিব হিসাবে রণবীর সিং, প্রাক্তন বোর্ড সচিব এ ডব্লু কানমাদিকার এবং আর একজন? ভাবুন তো কে? হ্যাঁ, নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান বাপু নাদকার্নি। তিনি কীভাবে সই করার অধিকার পান তা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান, ঐ মিটিংয়ে থাকেনই বা কেন? থাকার যোগ্যতাই বা কী করে পান বা থেকে সই-ই বা করেন কীভাবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

মণিন্দার অপমানিত?

কলকাতার এক দিনের ম্যাচের কথা নিশ্চয় এখনও ভোলেন নি? অষ্টাশির দ্বিতীয় দিনে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখ থুবড়ে পড়েছিল ইডেনে। অধিনায়ক হিসাবে রবি শাস্ত্রী, কলকাতার এক দিনের ম্যাচের পর, বেশ ভাল রকমই একটি 'লিফট' পেয়েছিলেন। ওঁর ফর্মের কথা ভাবলে, এই লিফট ছিল প্রায় অপ্রত্যাশিতই। কলকাতার ঐ একদিনের ম্যাচেই মণিন্দারকে বসিয়ে দেওয়ার কথা উঠেছিল। মণিন্দার, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় খেলেছিলেন এবং দুর্দান্ত বোলিং করে ওঁরা সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য মণিন্দারের এই যে ঐ ম্যাচেই বাঁহাতে আঘাত পাওয়ার জন্য তিনি পরের দুটি এক দিনের আন্তর্জাতিকে খেলার সুযোগ পাননি। তারপর, মাদ্রাজ টেস্টে তাঁকে আবার ডাকা হয়। এবং মাদ্রাজে পৌঁছনোর পর, ওঁর হাতের কন্ডিশন দেখে নির্বাচকরা ওঁকে দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। যার অর্থ একটাই যে 'ম্যাচ ফিস' হিসাবে তাঁকে বোর্ড একটি পয়সাও দেবে না। এবং যেদিন ওঁকে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেদিন থেকে ডেইলি অ্যালাউন্স দেওয়াও যে বন্ধ – একথাও একইসঙ্গে প্রযোজ্য ছিল। মণিন্দার মাদ্রাজের কনেমারা হোটেলে অরুণলালের রুমমেট ছিলেন। চলে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েও মণিন্দার কনেমারা হোটেলেই থেকে যান। এবং তার জন্য তিনি বোর্ডের কাছ থেকে একটি পয়সাও দাবি করেননি। এই পরিস্থিতিতে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে যা ভারতীয় ক্রিকেট

মহিন্দার বিদায়ী ম্যাচ খেলতে চান কলকাতায় অথবা লাহোরে

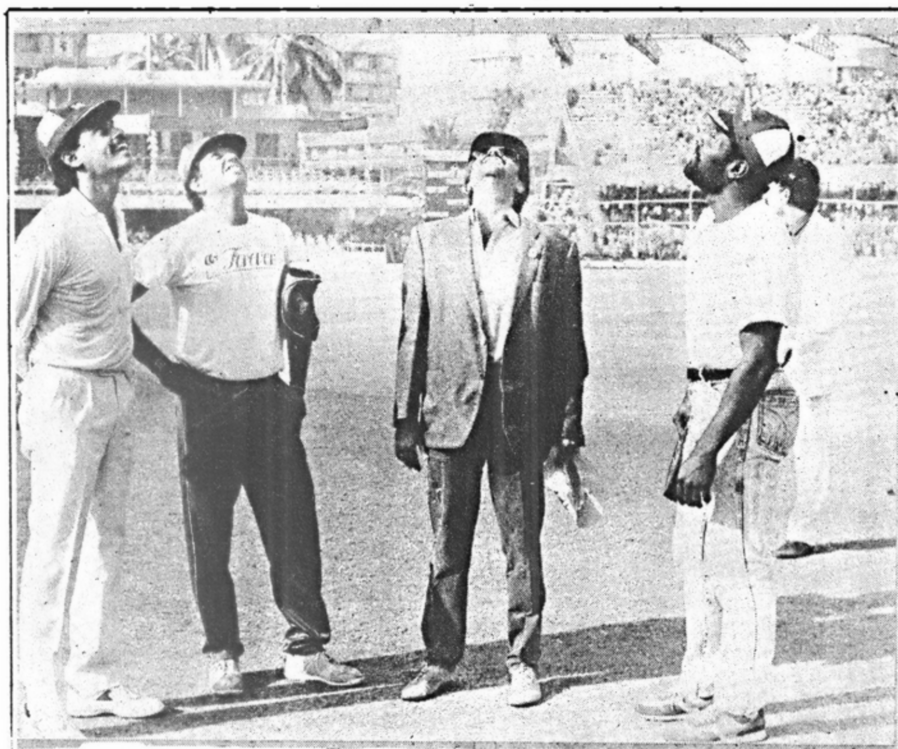
'কলকাতা বা লাহোরেই আমি খেলতে চাই আমার জীবনের বিদায়ী ম্যাচ।' বোরুচ থেকে বোম্বাই আসার পথে বাসেই হঠাৎ কথাটা বলেছিলেন ভারতীয় দলের সবচেয়ে সিনিয়র ক্রিকেটার মহিন্দার অমরনাথ। কারণ জানতে চাইলে কলকাতা সম্পর্কে যাবতীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জিমি বললেন, 'কলকাতার ইডেন আমার প্রিয় মাঠ। দুর্দান্ত পরিবেশ, চমৎকার ক্রাউড। বিশ্বের অন্য কোথাও এই ক্রিকেট পরিবেশ নেই। ওখানে খেলতে দারুণ লাগে আমার। আমি ভাগ্যবান যে, ইডেনে কিছু রানও পেয়েছি। এমনকি, শেষ যে ম্যাচটায় খেলেছি, সেটাতেও। ওখানে খেলেই অবসর নিতে পারলে খুশি হব না?' কলকাতার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু লাহোরের নাম একই সঙ্গে উচ্চারণ করছেন কেন? প্রশ্নের জবাবে মহিন্দার অমরনাথ বললেন,



'অবাক হচ্ছেন তো? স্বাভাবিক? কিন্তু অনেকেই জানেন না, লাহোরের প্রতি আমার দুর্বলতা প্রচণ্ড। শুধু তাই নয়, লাহোরের সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের সেন্টিমেন্ট। দেশ যখন অবিভক্ত ছিল, আমার আত্মীয়রা, বিশেষ করে বাবা ওখানে প্রচুর যেতেন। ওখানে অলিতে-গলিতে ঘরে ঘরে লালা অমরনাথের নামটা সবাই জানে। বাবাকে এক সময় তো লাহোর পুত্রই বলা হত। তারপর ধরুন, আমি ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর আবার ফিরে তিরাশিতে, লাহোরেই শতরান পাই, কিন্তু আমার সেই ইনিংসেই বেঁচে যায় ভারতের পরাজয়। লাহোরের সব রাস্তায় যেমন বাবাকে চেনে, চেনে আমাকেও। এখন লাহোরকে প্রায় হোমটাউনই মনে হয়। বিদায়ী ম্যাচ ওখানে হলে, খারাপ লাগার কথা নয়, তাই না?

বোর্ডের প্রেক্ষাপটে একেবারেই অভিনব।

ব্যাপারটা খুলে বলা যাক। মদ্রাজ টেস্টের বিরতির দিন সকাল আটটার সময় ক্রিকেটারদের হোটেলের লবিতে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবাই ঠিক সময়ে লবিতে জড়ো হয়েছিলেন। মণিন্দারও এসেছিলেন। কিন্তু, জানেন কি ভারতীয় দলের ম্যানেজার জি এস রামচাঁদ মণিন্দারকে দলের ক্রিকেটারদের মাঠে যাওয়ার বাসে উঠতে দেননি। রামচাঁদের যুক্তি ছিল : তুমি এখনও মদ্রাজে বসে আছ কেন? দিল্লিতে ফিরে যাও এবং ট্রিটমেন্ট করাও। আমি চাইনা, তোমার বাসে ওঠার খবর ছেপে অকারণে সাংবাদিকরা এক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করুক। মণিন্দার এরপর মদ্রাজে দুদিন ছিলেন। ছিলেন অরুণলালের রুমমেট হিসাবে। তিনি একা আলাদা গাড়ি নিয়ে মাঠে গেছেন। ড্রেসিংরুমেও তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি ড্রেসিংরুমের সামনে, ফেন্সিংয়ের পিছনে বসে খেলা দেখেন। অপমানিত হয়েও মণিন্দার কেন মদ্রাজে পড়ে ছিলেন তা জানা যায়নি।



টসের সময় কোন আম্পায়ার কোন ম্যাচে উপস্থিত থাকেন – এমন কথা আপনারা জানেন কি? ৩১ জানুয়ারি নেহরু শতবার্ষিকী ম্যাচে দুই অধিনায়ক ভিভ রিচার্ডস এবং দিলীপ বেংগসরকার টস করছেন। আম্পায়ার হিসাবে উপস্থিত চিত্রতারকা অনিল কাপুর। ছবি: অ্যান্টনি অ্যাজাভেদো

মোরে এবং পাঁচ হাজার

কলকাতার একদিনের ম্যাচের পরই, কিরণ মোরে জেনে গিয়েছিলেন যে আমেদাবাদ এবং রাজকোটে অনুষ্ঠিতব্য এক দিনের ম্যাচ থেকে তিনি বাদ পড়েছেন। ভগ্ন হৃদয়ে মোরে টীমের অন্য সদস্যদের সঙ্গেই বোম্বাই যাচ্ছিলেন। ওঁর উদ্দেশ্য ছিল বোম্বাই থেকে বরোদা যাওয়া এবং টীমের সদস্যরা বোম্বাই থেকে পরের দিন সকালে রাজকোটের পথে রওনা হওয়া। সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরেই মোরেকে রবি শাস্ত্রী এবং সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান বাপু নাদকার্নি বলেন যে তাঁকে রাজকোট যেতে হবে। রাজকোটের একদিনের ম্যাচের দিন সকালে মোরে জানতে পারেন যে তিনি দলের সদস্য নন। তাহলে তাঁকে কেন রাজকোটে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল? কোন সদুত্তর কোন পক্ষই দিতে পারেনি। মোরে ম্যাচ ফিস তো পানইনি। এমনকি বিমান ভাড়া পর্যন্ত পাননি। এমনই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছিলেন রবি শাস্ত্রী। তিনি মোরেকে নিজের ম্যাচ ফি (পাঁচ হাজার টাকা) তুলে দিয়ে বলেন, 'যেহেতু আমি তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম, সেহেতু আমারও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। তুমি এই পাঁচ হাজার টাকা নাও।' মোরে সঙ্গে সঙ্গেই রবিকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, 'রবি, এটুকুই যথেষ্ট। টাকা তুমি ফেরত নিয়ে নাও। আমার পক্ষে টাকা নেওয়া সম্ভব নয়। তবে, তোমার এই উদার মানসিকতার কথা কোনদিন ভুলব না।'

অরুণলাল ও আজহারউদ্দিন

আচ্ছা, প্রিয় পাঠক (পাঠিকারাও বটে) আপনি কি কখনও অরুণলাল এবং আজহারউদ্দিনকে এক সঙ্গে ব্যাট করতে দেখেছেন। যদি, সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দেখে থাকেন, তাহলে একথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আপনি দুজনের মাথায় একই ধরনের হেলমেট দেখেছেন। দুজনের মাথায় শোভা পেয়েছে সবুজ হেলমেট। এবং দুটোই আকৃতিতে একই রকম।

একটু কৌতূহল হয় বৈকি! রাজকোটে এই কৌতূহল মেটালেন অরুণলাল। এবং মজার ব্যাপার হল এই যে ঐ কৌতূহল নিরসনের সময়, পাশে বসে ছিলেন আজহারউদ্দিন।



অরুণলালই শুরু করেছিলেন, 'জানেন তো আমি আজহারউদ্দিনের হেলমেট মাথায় দিয়ে খেলছি।'

– 'তার মানে?'

তাকিয়ে দেখি আজহারউদ্দিনও মিটমিট করে হাসছেন। অরুণলাল আবার শুরু করলেন, 'রিলায়েন্স কাপের কন্ডিশনিং ক্যাম্পে হঠাৎ একদিন দেখেছিলাম যে আজহার তার হেলমেট ফেলে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যাপারটা কী? আজহার জবাবে বলেছিল যে হেলমেট থেকে স্ক্রু খুলে যাওয়ায় ও নাকি আর ব্যবহার করবে না। একই সময়ে আজহার বলেছিল যে ঐ হেলমেট দিয়েই ও টেস্টে আবির্ভাবের পর, পরপর তিনটি শতরানের ইনিংস খেলেছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওটা নিয়ে নিয়েছিলাম এবং কলকাতায় ফিরে এসে ঐ স্ক্রুগুলি মেরামত করে ঠিক করে নিয়েছিলাম। সেই থেকে আমি আজহারের ঐ পরিত্যক্ত হেলমেটই ব্যবহার করছি।' এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আজহার বললেন, 'আমার এই রঙের এবং এই কোয়ালিটির হেলমেট খুব পছন্দ। তাই, অরুণ আমার পুরনো হেলমেটটা নিয়ে নেওয়ার পর আমি ওরকমই একটা কিনে নিয়েছি।'

ব্রিজেশ প্যাটেল মনে করেন

‘অকারণে, আমি অনেকের কাছে ‘বুড়ো’ হয়ে গেছি !’



দেবাশিস দত্ত

ওঁর বয়স পঁয়তিরিশ। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এখনও নিয়মিত রান পাচ্ছেন। এই তো সেদিন, কেরলের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফিতে তিনি সাতাশতম শতরান পেলেন। ওঁর থেকেও বয়সে বড় মহিন্দার অমরনাথ এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে খেলছেন। কিন্তু, ধারাবাহিকভাবে রান পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি, ব্রিজেশ প্যাটেল কেন জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না?

ব্রিজেশ বরুজে এসেছিলেন পারসানা বেনিফিট ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে। বোম্বাই থেকে বরুজ যাওয়ার পথে ওঁর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের রাতে ব্রিজেশের সঙ্গে কথা হল ডিনারের পর। জি এন এফ সি-র দুর্দান্ত গেস্ট হাউসের সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই ব্রিজেশ বললেন, ‘আর ভাল লাগছে না। এখন আর প্র্যাকটিসও করি না। সোজা মাঠে যাই এবং কোনরকম প্র্যাকটিস ছাড়াই ম্যাচ খেলছি। তবে, সম্ভবত এটাই আমার শেষ মরসুম।’

বুঝুন একবার, কোনরকম প্র্যাকটিস ছাড়াই ব্রিজেশ রনজি ট্রফিতে পর পর শতরান করে চলেছেন। বাঙ্গালোরে যে কোন ক্রিকেটপ্রেমিককে ব্রিজেশ প্যাটেল সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলুন, আমি নিশ্চিত, আপনি একটি উত্তর পাবেন, ‘ব্রিজেশের প্রতি নির্বাচকরা অবিচার করেছেন।’

ব্রিজেশ এখন আর আশা করেন না যে, তাঁকে আবার জাতীয় দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এবং এ ব্যাপারটা নিয়ে তিনি আর কিছু ভাবতেও চান না। তবে, তাঁর দুঃখ একটাই যে সাত-আট বছর আগে হেলমেট ব্যবহার করতে পারলে, তাঁকে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হত না।

হেলমেট ব্যবহার করার পর থেকেই ব্রিজেশের খেলার ধরণটাই পাল্টে গেছে। ব্রিজেশ এখন আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ভয়াবহ পেস বোলিংয়ের বিপক্ষে মাথায় হেলমেট না পরে ব্যাট করতে গিয়ে ব্রিজেশ বিশ্রীভাবে কখনও আঘাত পেয়েছেন, আবার কখনও বা আউট হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু, হেলমেট ব্যবহার করার পর? না, না, দর্শকরা মাঠে তখন অন্য এক ব্রিজেশ প্যাটেলকে দেখতে শুরু করেছিলেন। সে ব্রিজেশ শুধুই আত্মবিশ্বাসের প্রতীক ছিল। স্বয়ং ব্রিজেশ কী বললেন? ‘কক হেলমেট মাথায় থাকা মানে, ব্যাটসম্যান অনেক নিশ্চিন্তে ব্যাট করতে পারে। ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে তাঁর আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা তখন অনেক কমে যায়। আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সে তো আপনারা সকলেই জানেন, ইটস নাউ এ ডিফারেন্ট গেম টোটালি। আমার সময়কার অনেক ক্রিকেটার তো ফিরে এল। আমিই শুধু পারলাম না।’

—‘কিন্তু কেন, ব্রিজেশ?’

ব্রিজেশের স্পষ্ট জবাব ‘তা তো বলতে পারব না। এটা নির্বাচকদের ব্যাপার। জাতীয় দলের কথা বাদ দিন, আমাকে তো দক্ষিণাঞ্চল দল থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। রনজি ট্রফিতে ভাল পারফরমেন্স করার সুবাদে ক্রিকেটারদের নাকি দলীপ ট্রফিতে সুযোগ দেওয়া হয়। তা আমার ক্ষেত্রে কী হল? যত অনিয়ম, যত অবিচার — সব আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে! আমি কারোর নাম করতে চাই না, এই অষ্টাশিতেও আমার চেয়ে বেশি বয়সের ক্রিকেটার ইন্ডিয়া টীমে খেলছে। তাহলে এটাও প্রমাণিত যে, বয়সটা কোন ফ্যাক্টর নয়। তাহলে এবার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন — আমি রান পাচ্ছি একজন সিনিয়র ক্রিকেটার হিসাবে, এবং ইন্ডিয়া টীমে আমার চেয়ে বেশি বয়সের ক্রিকেটার খেলে গেছে এবং এখনও খেলছে। তাহলে আমি কেন সুযোগ পাচ্ছি না? এই প্রশ্ন নিজের মনে অসংখ্যবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। কিন্তু, কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে, নিজের মনের যাবতীয় ক্ষোভ এখন চাপা পড়ে গেছে। এখন আর কোন ক্ষোভ নেই। সাত-আট বছর আগে হেলমেট ব্যবহার করতে পারলে আমার এমন অবস্থা হত না। আপাততঃ নিজে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করি রনজি ট্রফিতে ব্যাট করে। বয়স পঁয়তিরিশ। অন্যদের তুলনায় একটু আগেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছি। ফলে, অকারণে আমি অনেকের কাছে ‘বুড়ো’ হয়ে গেছি! ভারতের সব বোলারদের বিপক্ষে আমার সেঞ্চুরি আছে। তাহলে কি ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরমেন্স-এর কোন দাম নেই?”

রনজি ট্রফিতে সর্বাধিক শতরানকারী এবং সর্বাধুনিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটসম্যানের ঐ প্রশ্নের জবাব সেদিন দিতে পারিনি।



ভেঙ্কটরাঘবন ও ব্রিজেশ প্যাটেল। ছবি : শান্তি সেন

মন্তব্য

'কৃষ্ণেন্দু আর অমিত নাকি মোহনবাগান ছাড়ার জন্য আমাকে দায়ী করেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ওরা যদি আমার সম্পর্কে কিছু বলেও থাকে, তবু শুভেচ্ছাই জানাচ্ছি।'

সুব্রত ভট্টাচার্য

●

'কেউ কেউ দেখছি মোহনবাগান ছাড়ার ব্যাপারে বাবলুদাকে (সুব্রত ভট্টাচার্য) দোষ দিচ্ছে। আসল কারণ কিন্তু অন্য। অন্তত: একজন ডিফেন্ডারের ক্ষেত্রে জানি, সে চিমার ভয়েই পালিয়েছে।'

প্রশান্ত ব্যানার্জি

●

'মাঝে মাঝে ভাবি, আরও অনেক,অনেক দিন জাতীয় দলের হয়ে ডেভিস কাপে খেলব। কিন্তু সেটা অন্যায় হবে। তরুণ খেলোয়াড়দের স্বার্থে উচিত নয়।'

বিজয় অমৃতরাজ

●

'সহ খেলোয়াড়দের অনুরোধ সত্ত্বেও দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে আমি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়ছি না। শাস্তি মাথা পেতেই নিচ্ছি।'

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দেওয়া শাস্তি প্রসঙ্গে

দিলীপ বেঙ্গসরকার

●

'নিরপেক্ষ – শব্দটা ক্রিকেটের পক্ষে অপমানজনক। সব আম্পায়ারই নিরপেক্ষ। আম্পায়ারিং নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় চলছে, আমার মতে তা সমাধানের পথ হল, সেরা আম্পায়ারদের নিয়ে একটা প্যানেল তৈরি করা এবং তাঁদের দিয়ে সর্বত্র আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করানো।'

ভিভিয়ান রিচার্ডস

●

'আম্পায়ারদের সম্পর্কে অধিনায়করা যে গোপন রিপোর্ট দেয়, তা সত্যিই গোপন রাখা উচিত। কর্মকর্তাদের উচিত নয় আম্পায়ারদের জানানো, কে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে।'

ভিভিয়ান রিচার্ডস

●

'এখন যেভাবে খেলছি, তা অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না। তবে, অবসর নেওয়ার পর খুবই দুঃখ পাব। কারণ টেনিস আমার অনেক কিছু, দেশবিদেশের দর্শকরা আমার অনেক কিছু।'

বিজয় অমৃতরাজ

●

'এখনও ভারতীয় টেনিসে বিজয়ের বিকল্প নেই। তবু, দীর্ঘদিন একটানা খেলছে। চিরকাল বিজয় একাই ভারতকে টেনে নিয়ে যাবে, এটা ভাবা ঠিক নয়।'

রমেশ কৃষ্ণান

●

'একসময় কলকাতা সুনীলকে(গাভাসকার) অপমান করেছিল। শুনলাম, এবার ও দারুণ অভ্যর্থনা পেয়েছে। যাক, ভালবাসা জানিয়ে পাপ ধুয়ে ফেলেছে কলকাতা।'

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ



'এখনকার কোচেরা শুধুই কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন, ফুটবলাররা দৌড়চ্ছে টাকার পেছনে এবং যত কিছু দুর্নীতি তার সবটাই কর্মকর্তা-দের আয়ত্তে। ফুটবল এগোবে কী করে।

শৈলেন মান্না



'ফুটবল নিয়ে কোনও কথা বলা তো দূরের কথা, মাইক ধরার অধিকারই শৈলেন - মান্নার নেই। সরকারি টাকায় বিদেশে গেছেন, তার কতটুকু ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

অমল দত্ত



'কোচ নয়, ফুটবলার নয়, প্রথম দোষী এ আই এফ এফ। যতদিন এই অপদার্থ কর্মকর্তারা ক্ষমতায় থাকবেন, ফুট-বলে উন্নতি সম্ভব নয়।'

চুনী গোস্বামী

মন্তব্য

'একজন আন্তর্জাতিক মানের বোলারের মত, হিরওয়ানি এখনই বলকে ঘোরাতে পারে না। ওর বলে বৈচিত্র্য খোঁজার সময় অবশ্য এখনও আসেনি।'

বিষাণ সিং বেদি

●

'আমি হতাশ, কিন্তু শোকাহত নই।'

এশীয় কাপের দল থেকে বাদ পড়ার পর

অরুণলাল

●

'মান্নাদার সম্পর্কে অমলদার বক্তব্য অদ্ভুত। ফুটবলের যে কোনও ব্যাপারেই মান্নাদা কথা বলার অধিকার রাখেন, অমলদার চেয়ে একটু বেশিই।'

সুব্রত ভট্টাচার্য

●

'তরুণরা যেভাবে পরিণত হল, তাতে এরপর দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য তো আমাকেও লড়তে হবে!'

গার্ডন গ্রীনিজ

●

'কমবয়সীদের নিয়ে ফুটবলের জন্য বেসিক ট্রেনিং 'মাস্ট'। ভবিষ্যতে ভাল ফল তাহলেই আসতে পারে।'

প্রসূন ব্যানার্জি

●

'৪-৪-২ ছককে আমি খারাপ বলতে পারছি না। ভবিষ্যতে রপ্ত হলে এই সিস্টেমেই সাফল্য আসতে পারে।'

গৌতম সরকার

●

'আমাদের কোচেরা সিস্টেম নিয়ে এমন কচাকচি শুরু করেছেন যেন ছক তৈরিই ফুটবলে প্রথম ও শেষ কথা। এই ধারণাই প্রমাণ করে দিচ্ছে, ফুটবলে এখনও আমরা কত পিছিয়ে।'

চুনী গোস্বামী

●

'আমাদের দেশে আমেদ খান, জার্নেল সিং, বলরামদের অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য নেই। মূল্য রয়েছে অশোক ঘোষের মত নন-টেকনিক্যাল লোকেদের। আমি কি জানতে পারি, অশোক ঘোষ ফুটবলের কী বোঝেন'?

চুনী গোস্বামী

●

'চুনী গোস্বামী আজ দেশ ও জাতীয় স্বার্থের কথা বলছেন? সবাই জেনে রাখুন, তিনি যখন মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল-সচিব ছিলেন, ক্লাবের স্বার্থে জাতীয় দল থেকে ফুটবলার ছাড়াতে আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন।'

অশোক ঘোষ

●

'অনেক সময় এমনভাবে হারতে হয়, যার কোনও ব্যাখ্যা থাকে না। এই হারটাও ঐ রকমেই – কোনও ব্যাখ্যা নেই।'

– ডেভিস কাপে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ডাবলসে হারার পর

আনন্দ অমৃতরাজ



টানা চারবার নেহরু কাপ জিতেও রাশিয়া বলছে ‘আর আসব না’

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কেন এই নেহরু কাপ?

শিলিগুড়ি থেকে ফিরে সরোজ চক্রবর্তী



চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রাশিয়ার অধিনায়ক। পুরস্কার দিতে দেখা যাচ্ছে অশোক ঘোষ ও অজিত পাঁজাকে।

ছবি : বিকাশ সাধু

প্রশ্নটা উঠেছে, রাশিয়া কি আর নেহরু গোল্ড কাপে খেলতে আসবে? জানি, এ আই এফ এফ জোর দিয়ে বলবে, রাশিয়া এবং চীন যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন নেহরু কাপে যোগদান করবেই। কমিউনিস্ট দল বা দেশগুলোর উপর এ আই এফ এফের একটা স্থায়ী দাবি জন্মে গেছে, প্রচন্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা ভারতের খেলার ডাক প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। সম্ভবত এই প্রথম রাশিয়া ও চীনের কাছে বড় রকমের ধাক্কা খেতে চলেছে এ আই এফ এফ। নেহরু কাপের প্রতিযোগী দলগুলো না চেনে কেরল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে, না চেনে আই এফ এ-কে। এ আই এফ এফের বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশী দলগুলো নেহরু কাপে খেলতে আসে। এবার, শিলিগুড়িতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাশিয়া সহ প্রায় সব দলই বেশ ক্ষুব্ধ। হাত খরচের টাকা, ফাইনালের তারিখ, নিরাপত্তা কর্মীদের বাড়াবাড়ি, প্র্যাকটিস মাঠ ও সময়, মাঠের ভিতর অতিরিক্ত লোক – এসব ব্যাপারে রাশিয়া সহ সব দলই অভিযোগ করে গেছে। এ-ও জানি, আই এফ এ-র ভূরফুঁই কর্মকর্তা ও কর্মীরা বলতে চাইবেন এসব এই প্রতিবেদকের বানানো গল্প। চীন দল যেদিন শিলিগুড়ি ছাড়ল, সেদিন তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আই এফ এ-র কোন প্রথম সারির কর্মকর্তা বিমান বন্দরে হাজির ছিলেন না। এ নিয়ে চীন দল বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করে গেছে। রাশিয়া দল বারবার বলে এসেছে, ফাইনাল ৩ ফেব্রুয়ারি খেলতে

চায়। ম্যানেজার মিটিংয়েও রাশিয়ার প্রতিনিধি সে কথা পরিষ্কার জানিয়েছেন। কিন্তু আই এফ এ এবং এ আই এফ এফ পরোক্ষ ভাবে তাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে আই এফ এ সচিব কথা দিয়েছিলেন, ফাইনালের দিন বাগ-ডোগরা থেকে বিমান যাতে দেরিতে ছাড়ে তার ব্যবস্থা করবেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, রাশিয়া দলের সাতজন ফুটবলার যখন বিমান বন্দরে পৌঁছন ফাইনালের পর, দেখেন বিমান অনেক আগেই বাগডোগরা ছেড়ে চলে গেছে। এবং এ নিয়ে পরে রাশিয়া দল প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে। হাত-খরচের টাকা নিয়ে বুলগেরিয়া রীতিমত লোক্যাল ম্যানেজারকে হুমকি দেয়। এবং ফিরে যাবার হুমকি দেয়।



হাংগরীর কাছে হেরে যাওয়ার ঠিক পর ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ছবি : বিকাশ সাধু

নেহরু কাপ এখন চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই প্রতিযোগিতার জন্য অজিত পাঁজার উদ্যোগে প্রতিদিন সরাসরি দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ ম্যাচ দেখিয়েছে। প্রায় ৭0 জনের বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ যে খরচ দেখিয়েছে, তা যদি খেলাধুলোর উন্নতির জন্য ব্যয় হত তাহলে কাজে লাগত। আই এফ এ-র কর্মীরা দূরদর্শনের সামনে নিজেদের চেহারা দেখাতে প্রতিদিন যে কুরুচিপূর্ণ লড়াইয়ে নেমেছিলেন তা দেখে শিলিগুড়ির দর্শক প্রচন্ড হাসাহাসি করেছেন। এবং ফাইনালের দিন মাঠের ভিতর প্রায় পাঁচশ লোক ঢুকে পড়লেন দূরদর্শনের মোহে। এতে আই এফ এ-র কর্মকর্তারাও অসন্তুষ্ট। এছাড়া ব্যাপকহারে টাকা খরচ হয়েছে, যা আই এফ এ-র কিছু কর্মকর্তার চোখে ভাল লাগে নি। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়েছে। নেহেরু কাপের নামে আই এফ এ, রাজ্য সরকার ও অজিত পাঁজা জনগণের টাকা নিয়ে 'নয়ছয়' করেছেন। রাশিয়া ও পোল্যান্ড ছাড়া আর কোন দেশ শক্তিশালী দল নিয়ে নেহরু কাপে খেলতে আসেনি। যোগ্য দল হিসাবেই রাশিয়া এবার ২-0 গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল। এবং এবার নিয়ে টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন রাশিয়া। প্রচন্ড পেশাদার দলের মত ফুটবল খেলে, বাড়তি পরিশ্রম না করে ফাইনালে পোল্যান্ডকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল রাশিয়া। রাশিয়ার ফুটবল এখন যে কোন ইউরোপীয়ান দেশের কাছে শিক্ষণীয়। কীভাবে ম্যাচ বের করতে হয়, কখন পাল্টা আক্রমণ গড়ে বিপক্ষ দলকে কোণঠাসা করতে হয়, এসব অঙ্কের মত রুশ ফুটবলারদের মাথায় ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে নেহরু কাপ, প্রতিযোগিতা দর্শকদের নতুন স্বাদ এনে দিতে পারেনি। দু-তিনটি ম্যাচ ছাড়া এই প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক ফুটবলের ছোঁয়া পাওয়া যায় নি।



রাশিয়া বনাম ভারত : পরাজিত মস্তান ও দেবাশিস মুখার্জি। ছবি : বিকাশ সাধু

সবশেষে বড় কথা, নেহরু কাপ যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিল এ আই এফ এফ, এখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। বিনা প্রস্তুতিতে ভারতীয় দল নেহরু কাপে খেলছে, হারছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির বিদেশী দলের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের দল যে ফুটবল খেলছে, তাতে স্থানীয় দর্শকদের হতাশাই বাড়ছে। এ নিয়ে কারর মাথাব্যথা নেই। অশোক ঘোষ, জিয়াউদ্দিন, লক্ষ্মণন, বিশ্বনাথন, আবদুল্লা ও প্রদ্যুৎ দত্তরা এই প্রতিযোগিতাকে নিয়ে রাজনীতির লড়াইয়ে নেমেছেন। ব্যবসার কথা ভেবে দশ লক্ষ টাকা 'গ্যারান্টি মানি' দিয়েও নেহরু কাপের পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এবং এবার, এই লড়াইয়ে নামতে গিয়ে আই এফ এ বিরাট টাকার লোকসান করেছে।

শুনছি, এ আই এফ এফ ভেবেছে পরবর্তী নেহরু কাপ তারা সরাসরি পরিচালনা করবে। কেরলে মার্চ মাসে যে সভা বসছে, সেখানে তা নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আলোচনা করার মত মানসিকতা নেই।•



মজিদ 'বাদশা' বাসকার চিরতরে ফিরে যাচ্ছেন ইরানে ?

পার্থ সারথি ঘোষ



মজিদ 'বাদশা' বাসকার অবিলম্বেই কলকাতাকে বিদায় জানাবেন। ক্লাব সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লা তাঁকে বলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বা ইলিয়ট রোডে ক্লাবের মেসবাড়ি আর তার ঠিকানা নয়। তবে এই দুইয়ের বাইরে মজিদ যেখানে যেতে চান, যেতে পারেন এবং শেষবারের মত তাঁর 'বিদায় বাবদ' ক্লাব যাবতীয় খরচ-খরচা বহন করতেও প্রস্তুত। সচিবের বক্তব্যের পর মজিদ জানালেন, তিনি স্বদেশে অর্থাৎ ইরানে ফিরে যাবেন। অবশেষে ইব্রাহিম আলি মোল্লা মজিদের ইরান ফিরে যাবার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যান। মজিদের ইরান ফিরে যাবার দিনক্ষণ ধার্য না হলেও, সচিব মোল্লা জানান, 'যত শীঘ্র সম্ভব ওঁর বিমানের টিকিট কেটে দেব এবং মজিদও ইরান ফিরে গেলে বাঁচি। প্রত্যেকদিন ওঁর নামে সব গুরুত্বর অভিযোগ। কোনদিন পুলিস কেস খেয়ে যাবে বা মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে। বিদেশি ফুটবলার, তখন সব দায় এসে পড়বে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেরই ওপর। অথচ দেখুন গত তিনবছর ধরে ক্লাব মজিদের থেকে কোন সার্ভিস বা উপকার পায়নি। তা সত্ত্বেও মেসে থাকতে দেওয়া, দুবেলা খাওয়া – সামান্য কিছু হাত খরচ সবই পাচ্ছিল। গতবছর নঈম সাহেব কত চেষ্টা করে ওঁকে মাঠে পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু আবার যে কে সেই। ক্লাব কেন এত অশান্তি নিয়ে, একটা বোঝা ঘাড়ে রাখবে। তার চেয়ে যা খরচ লাগে লাগুক, আমরা মজিদকে ইরান পাঠিয়ে দিতেই এখন সম্মত।'

মজিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? মোল্লা জানালেন, কি অভিযোগ নেই প্রশ্ন করুন। রোজ রাতে অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় মেসে ফেরে। তারপর অন্যান্য হকি-ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে মারামারি, দুর্ব্যবহার এবং অসভ্যতা করেছে। জন্ডিসে অসুস্থ খেলোয়াড়ের খাবার উল্টে দিচ্ছে। খেলোয়াড়দের রাখা জুতো বেচে দিচ্ছে। ক্রিকেট সচিবের সঙ্গে মারামারি করেছে। ক্লাবে এসে কর্মকর্তাদের গালিগালাজ করছে। গ্রাউন্ড সচিবের গাড়ি ভেঙে দিচ্ছিল। বাজে নেশার কবলে



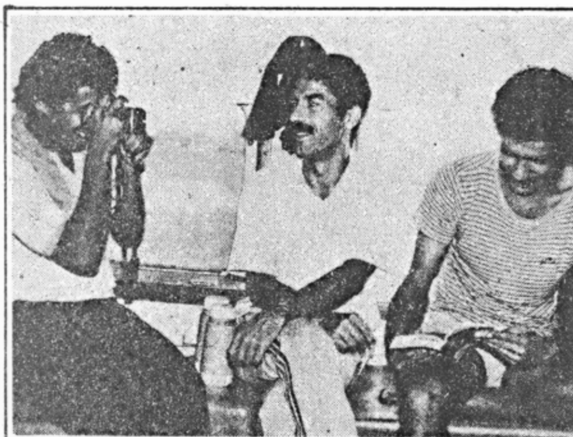
মজিদ যখন ইস্টবেঙ্গলে। ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

পড়েছে। সব মিলিয়ে মজিদকে রাখতে গেলে আর সবাই ক্লাব ছেড়ে চলে যাবে। মজিদ 'great player' সম্মান দিয়েই তিনবছর পুষেছি। কিন্তু এখন যা করছে তারপর আর ক্লাবে রাখা যায় না। জামশিদের সংগেও আলোচনা করলাম। আর মজিদ নিজেই যখন ইরানে ফিরে যেতে চাইছে, তখন তাই হোক। সুতরাং একটা কথা বলা যায়, ৮০-র দশকে কলকাতা ফুটবলের বহু সুরভিত গোলাপের, সেরা 'বসরাই' গোলাপটিও (মজিদ) অবশেষে কলকাতাকে বিদায় জানাচ্ছেন। সুতরাং আবারও ময়দানের সবুজ ঘাস চিরে বসরাই গোলাপের উঁকি মারার প্রত্যাশায় যাঁরা বসেছিলেন, বাদশা নিজেই তাঁদের এবার হতাশ করে ইরানের পথে ফিরে যাচ্ছেন। বিদায় মজিদ 'বাদশা' বাসকার।

মজিদ বাসকারের কলকাতা ত্যাগ করা এই শহরের ফুটবল-প্রেমীদের কাছে একটা ঘটনার মত ঘটনা মনে হলেও, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কিন্তু এই নিয়ে কোন তাপ-উত্তাপ নেই। বরং, ১১ ফেব্রুয়ারি নতুন কোচ অমল দত্তকে নতুন করে পেয়ে, ওইদিনই প্রথম মহমেডান স্পোর্টিং কোচ এবং ফুটবলাররা সরকারিভাবে ৮৮ ফুটবল মরসুমের প্রথম অনুশীলনে নামলেন। অবশ্য তার আগেই মহমেডান স্পোর্টিং দল নতুন ফুটবল মরসুমের ট্রফি জয় অভিযান শুরু করেছে। প্রথম দিনই ক্লাব তাঁবুতে গিয়ে দেখি প্রচন্ড খুশির হাওয়া। প্রত্যেকেরই এক বক্তব্য আমরা 'সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপ' চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এমন প্রতিযোগিতায় যেখানে ইস্টবেঙ্গলের মত দল ছিল। এটাই আমাদের বড় প্রাপ্তি।' ১১ ফেব্রুয়ারি এই খুশির হাওয়ার মধ্যেই, জানিয়ে দেওয়া হল সেই নিষ্ঠুর-চরম ঘোষণাটি, অর্থাৎ এদিন সকালেই মোল্লা, মজিদের সংগে আলোচনা করে ওঁর কলকাতা ছেড়ে ইরানে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

মাত্র একদিন অনুশীলন। তারপর ১২ তারিখ বিকেলের বিমানেই মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবলাররা নাগজি ট্রফি খেলবেন। কোচ অমল দত্ত জানালেন, 'মোহনবাগানও যাবে বলে শুনতে পাচ্ছি। তবে জে সি টি, গোয়ার দল এবং ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং আসছে। এমেকাকেও সম্ভবত খেলতে দেখা যাবে।'

মহমেডান স্পোর্টিং কেমন খেলবে বলে আপনার ধারণা, অমলবাবুর দৃঢ় উত্তর: ভালই দল, ভাল খেলবে। শুধু একজন স্ট্রাইকার আর গোলরক্ষকের



তিন ইরানী মজিদ, খাবাজি ও জামসিদ ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

দরকার। সেক্রেটারির ছেলে (নওয়াজ) দিল্লিতে গেছেন আলিগড়ে নাকি এক ভাল সুদানিজ ফুটবলার আছে। ওকে আনা হবে, তবে নাগজিতে নেওয়া হবে না। কলকাতায় ওর অনুশীলন দেখে ক্লাবকে জানাতে হবে, কেমন ফুটবলার। ক্রিস্টোফারকে কেমন দেখলেন? অমলবাবু জানালেন, 'স্কিলটা নেই। তবে স্বাস্থ্য আছে। দেখি না কিছুদিন খেলিয়ে, হয়ত চলে যাবে। তবে গোলরক্ষক দরকার। সম্ভবত হেনরিকেই আনার চেষ্টা চলছে। এখন নাগজিতে নাসির আর দীপ্তিকেই নিয়ে যাব।'

কোচ অমল দত্ত, মহমেডান স্পোর্টিংয়ে মইদুলের খুব প্রশংসা করলেন। ওঁর মতে, মইদুল দলের কোচ-কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন 'ধর্ম-বয়স' ফুটবলারদের মধ্যে একটা যোগসূত্র, বোঝাপড়ার কাজ করে। ফুটবলারদের মনের অভাব অভিযোগটা জানার চেষ্টা করে। 'লিমিটের' মধ্যে থাকলে ভাল পাবলিক রিলেশন অফিসার। আবার মইদুল, মিহির, সমরদের মত সিনিয়র এবং বিভিন্ন জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে বেশ ব্যালান্সড দল। রক্ষণভাগের প্রশংসা করলেন কোচ। বিশেষত সুপ্রিয় এবং স্বপন বসুর ওপর তাঁর অনেক আশা। দলের মাঝমাঠও ভাল বলে সার্টিফিকেট দিলেন অমল দত্ত। এছাড়া জামশিদ, চিবুজারের মত স্ট্রাইকার এবং সন্দীপ, সুবীরকে নিয়ে উইং, সব মিলিয়ে খারাপ দল নয় বলে অমল দত্তর ধারণা। প্রথম দিন কোচ, কর্মকর্তা এবং ফুটবলারদের মধ্যে বেশ হার্দিক সম্পর্ক দেখা গেল। সচিব ইব্রাহিম আলি জানালেন, 'আমি খুশি। নতুন কোচ এবং ফুটবলাররা মিলে বছরের প্রথমেই ক্লাবকে ট্রফি দিল।' জামশিদ, কবীর, রণজিৎ, সুখেন, চিবুজাররা এই প্রথম অমল দত্ত-র কোচিংয়ে। আবার মিহির, সুবীর, সন্দীপ সহ অনেকেই এই ক্লাবে অমল দত্ত-র পুরনো ছাত্র আছেন। ফুটবলাররা প্রত্যেকেই নতুন কোচকে পেয়ে বেশ সন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রত্যেকেই বিশেষ কিছু না বললেও, আশা করছেন তারা অমল দত্ত-র প্রশিক্ষণে ভাল খেলবেন, ক্লাবও ভাল করবে। 'নঈম নেই, অমল দত্ত' – কোচ, এই ধরনের একটা স্বস্তির ভাব ফুটবলারদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল।



৮৭-রও নায়ক মজিদ ও সুরজিৎ ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

সরাসরি

এবার কৃষ্ণেন্দু রায়। দলবদলের জমজমাট নাটক যাঁকে ঘিরে কলকাতাকে উত্তাল করে তুলেছিল, সেই কৃষ্ণেন্দু রায়ের কাছে মোট চিঠি এসেছিল ১৪৮টি। সব চিঠিই তিনি পড়েছেন। উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্নও বেছে নিয়েছেন তিনি নিজেই। এরপর আসবেন শিশির ঘোষ। তারপর আসবেন যথাক্রমে বলাই মুখার্জি ও আব্দুল মজিদ।

● দেবকুমার গুপ্ত, ২০বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা – ৯

●● মোহনবাগান ছাড়লেন কেন?
আপনার প্রিয় ফুটবলার কে?
ফুটবল ছাড়াও আপনি কোন খেলা বেশি পছন্দ করেন?

●●● ব্যক্তিগত কারণে। অনেকেই আমার প্রিয় ফুটবলার। ভলিবল।

● মধুসূদন সিন্‌হা, পোঃ– সোনারপুর হাট, পশ্চিম দিনাজপুর

●● ভারতীয় ফুটবলে আপনার দেখা সেরা স্ট্রাইকার কে?

●●● শিশির। (বর্তমানে)

● বুট্টু, ধিরু, সুদীপ, কৌশিক ও গোবরা। হাতিমপুর, দুর্গাপুর – ১, বর্ধমান।

●● আপনার স্মরণীয় খেলা কবে, কোথায়? ইস্টবেঙ্গলে গিয়ে আপনি কি খুশি? বর্তমানে ভারতের সেরা স্টপার এবং মিডফিল্ডার কে?

●●● স্মরণীয় খেলা এখন খেলিনি। সবে তো শুরু। তরুণ দে, সত্যজিৎ।

● পাঁচুগোপাল হাজরা, কল্যাণগড়, হাবড়া।

●● বর্তমানে ভারতের সেরা ফরোয়ার্ড, গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডার কে?

●●● বর্তমানে শিশির, অতনু এবং তনুময়, তরুণ।

● দীপক দত্ত, কাঞ্চন দত্ত, শ্যামলা, বর্ধমান।

●● আপনার মতে সর্বকালের সেরা হাফ, স্ট্রাইকার এবং ডিফেন্স কে কে?

●●● গৌতম সরকার, সাবির আলি, সুব্রত ভট্টাচার্য।

● মৌমিতা সাহা, ৩৬ মহারাজানন্দ কুমার রোড, কলিকাতা – ৩৬, বরানগর

●● আপনার প্রিয় ব্যাটসম্যান কে?

●●● বেঙ্গসরকার।

● পার্থপ্রতিম ব্যানার্জি, ৯১/৯২ এল রাজা রামমোহন রায় সরণি, শ্রীরামপুর, হুগলি।

●● বাবলুদার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

●●● দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক।

●সঞ্জয় বিশ্বাস, মালবাজার

●● কার প্রেরণায় আপনি আজ এতটা ওপরে উঠে আসতে পারলেন?

●●● প্রথমত, আমার বাবা, গুরু শঙ্কর ব্যানার্জি এবং টালিগঞ্জের মন্টু ঘোষ।

● দেবকুমার গুপ্ত, ২০বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি – ৯।

●● ফুটবল খেলে আপনার স্বপ্ন কি? আপনার কাছে প্রশান্ত ব্যানার্জির চেয়েও কি টাকা, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এসব প্রিয়? নাহলে প্রশান্ত ব্যানার্জিকে ছেড়ে গেলেন কি ভেবে?

●●● সবার মন জয় করা। যখন যেখানেই থাকি প্রশান্তদার সঙ্গে সবসময়ই সম্পর্ক একইরকম। আর ক্লাবও ছেড়েছি ওঁকে বলেই।

● দীপক দত্ত/কাঞ্চন দত্ত, শ্যামলা, বর্ধমান।

●● এতদিন মোহনবাগানে খেলার পর শতবার্ষিকীতে ক্লাব ছাড়ার সময় আপনার কি মনে দুঃখ হয় নাই?

●●● শতবার্ষিকীতে আমাকেও ছেড়ে দেবার জন্য ক্লাবের লোকেদের কি দুঃখ হল না?

● কৌশিক চৌধুরী, মাইথন ড্যাম, ধানবাদ।

●● বিপক্ষের কোন ফরোয়ার্ডকে আটকাতে আপনাকে সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়েছে? বর্তমান পারফরমেন্সের ভিত্তিতে একটি সেরা ভারতীয় একাদশ গড়ে দেবেন?

●●● সেরকম কারুর নাম মনে পড়ছে না। অতনু, মজিদ, তরুণ, অমিত, অলোক, সত্যজিৎ, সুদীপ, বিকাশ, শিশির, কৃশানু, প্রদীপ।

● দেবকুমার গুপ্ত, ৫ডি লেবুবাগান লেন, কলিকাতা – ৩।

●● কোচ হিসাবে অমল দত্ত, শ্যাম থাপা, সৈয়দ নঈমুদ্দিন, পি কে ব্যানার্জি কাকে বেশি ভাল লাগে?

●●● নিঃসন্দেহে পি কে ব্যানার্জি।

●জালালউদ্দিন মণ্ডল, কে পি মিশন, কলিকাতা।

●● আপনি কি নিজেকে ভারতের সেরা লেফট ব্যাক মনে করেন? এ পর্যায়ে আপনার কি মনে হয়?

●●● আমার পজিশন- লেফট ব্যাক নয়, তবে প্রয়োজনে ক্লাবে এবং ভারতের হয়ে সব পজিশনেই খেলেছি।

● অরূপ মণ্ডল, খানো, বর্ধমান।

●● শিল্প ও শক্তিতে কে সেরা – মারাদোনা না প্লাতিনি?

●●● দু-বিভাগেই মারাদোনা শ্রেষ্ঠ।

● রথীন্দ্রনাথ দে, ১১১ জি টি রোড (পশ্চিম), শান্তিধাম, পোঃ – কোন্নগর।

●● এ পর্যন্ত জীবনের সেরা ম্যাচ কোনটি? এখন আপনার টার্গেট কী? আপনি কী পয়সার লোভে মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলে গেলেন? আন্তর্জাতিক ফুটবলে সেরা গোল কোনটি? আপনার হবি কী? ফুটবল জীবনে স্মরণীয় ঘটনা? সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্কে? ফুটবল জীবনে সুখ এবং দুঃখজনক ঘটনা?

●●● সেরা ফুটবল খেলিনি। আরও বেশ কিছুদিন ভাল খেলে আপনাদের মন জয় করা। কখনই নয়। মারডেকা, ১৯৮১। গান শোনা। অনেক ঘটনা আছে। খুবই ভাল। সুখ, আপনাদের ভালবাসা পাওয়া, আর দুঃখ এখনও পাইনি।

● জনার্দন অধিকারী, সন্তোষ চ্যাটার্জি, শ্যামলা, বর্ধমান।

●● সুদীপ, বিকাশ ও প্রশান্ত তিনজনের মধ্যে কাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মিডফিল্ডার মনে করেন?

●●● নিঃসন্দেহে প্রশান্ত।

● সজ্জন সিংহ রায়, পলাশী, নদীয়া।

●● কলকাতা মাঠের বর্তমান সম্ভাবনাময় ব্যাক কে? ৮৭-র সেরা ফুটবলার কে? আব্দুল মজিদ আর আপনি একদলে অসুবিধা হবে না? অমল দত্ত ও সুব্রত ভট্টাচার্যের মধ্যে কে বেশি ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন?

●●● শৈবাল চ্যাটার্জি। সত্যজিৎ চ্যাটার্জি। অসুবিধা হবার কারণ নেই। সুব্রত ভট্টাচার্য।

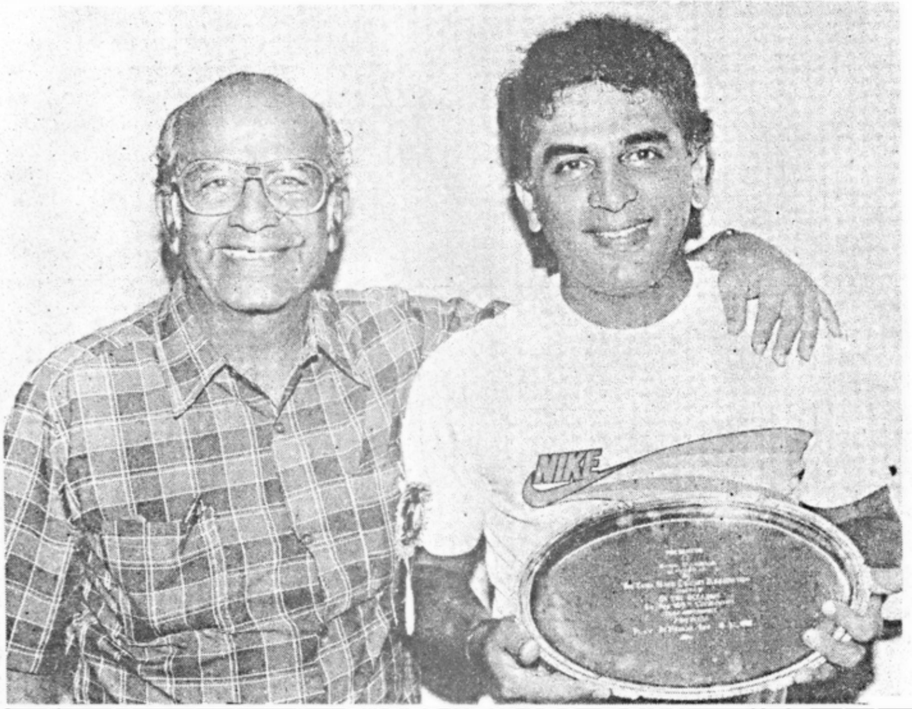
● দেবকুমার গুপ্ত, ৫ডি লেবুবাগান লেন, কলিকাতা – ১৯

●● ফুটবল ছেড়ে ভবিষ্যতে কী হবেন? পেছনে কোন গোলরক্ষক থাকলে সবচেয়ে বেশি ভরসা পান? আপনি কী মনে করেন, আপনার বা ফুটবলারদের জীবনে সাংবাদিকদের কোন ভূমিকা আছে?

●●● ভবিষ্যতে ফুটবলের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকার ইচ্ছা আছে। ভাস্কর, অতনু, তনুময় যে কোন একজনকে পেলেই। নিশ্চয়ই আছে, আমাদের পরিচিত তো সাংবাদিকদের মাধ্যমই।



মাঠ-ময়দানের ডায়েরী



মদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার কে নারায়ণাচারি ভারতের একমাত্র চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে সম্প্রতি একশ টেস্ট ম্যাচে ছবি তোলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ১৯৪৬-এ তিনি 'হিন্দু'-তে যোগ দেন। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ছবি তোলেন ১৯৪৮-৪৯-এ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। সম্প্রতি মদ্রাজে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। নারায়ণাচারি নিজের তোলা ছবির অ্যালবাম ছাড়াও কিছু উপহার তুলে দেন সুনীলের হাতে।

২৬ জানুয়ারি, ইন্টালির ছোট্ট মাঠে পনের বছরের কম বয়সীদের 'ফাইভ-এ-সাইড' হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল উপলক্ষে নক্ষত্রদের মেলা বসেছিল। বৌ হকি চ্যাম্পিয়ন হয়, ফাইনালে ৬-২ গোলে দুর্গাপুর এস এস এ-কে হারিয়ে। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাক্তন অলিম্পিয়ান কেশব দত্ত। ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় বালিগঞ্জের সম্মিলনী। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পায় বৌ হকির ক্রিস্টোফার। সে মোট ৩০ টি গোল করে। সেরা প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসেবে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় ইন্টালির (রেড) রাজীব মিশ্র। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বি এইচ এ সচিব কুমারেশ সেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুরবক্স সিং, ভেস পেজ, আব্দুল হামিদ, সুশীল ভট্টাচার্য প্রমুখ। খেলাটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আম্পায়ার সুশান্ত দে। সংবর্ধনা জানানো হয় অলিম্পিয়ান বীরবাহাদুর ছেত্রী ও 'অর্জুন' শান্তি মল্লিককে।

ছবি: নির্মল কুমার সাহা।





সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি রোহিনটন বারিয়া ট্রফি। সম্প্রতি মদ্রাজে ঐ প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ৫১১ রানে বাংগালোর বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। দিল্লি চার বছর পর আবার এই খেতাব জিতল। উল্লেখ্য, বাংগালোর ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ছবিতে কাপ হাতে দিল্লির ছাত্র-ক্রিকেটারদের দেখা যাচ্ছে।

নবতম আবিষ্কার জয়দীপ মুখার্জি

রতন ভট্টাচার্য



কলকাতা ময়দানে এখন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্রিকেটারের নাম জয়দীপ মুখার্জি। ওঁর বাবা দিলীপ মুখার্জি এককালের খ্যাতনামা অভিনেতা। প্রযোজক এবং পরিচালক। তিনি নিজেও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে যথেষ্টই ক্রিকেট খেলেছেন। সুতরাং ক্রিকেট খেলার প্রেরণা বলতে গেলে ওঁর জন্ম সূত্রেই পাওয়া। কলকাতায় স্কুলে পড়াকালীন সামান্য ক্রিকেট খেলেছেন জয়দীপ। কিন্তু এখান থেকে ক্লাস 'এইট' পাশ করার পরই বাবা মার, সংগে জয়দীপ আমেরিকায় চলে যান। ওখানে চার বছর কাটিয়ে ওঁ আবার ফিরে আসেন। যেহেতু আমেরিকায় ক্রিকেটের প্রচলন নেই। তাই তখন ওখানে ওঁকে শুধু ফুটবল আর অল্পস্বল্প টেনিস খেলেই সময় কাটাতে হয়েছে।

'কলকাতায় আসার পর থেকেই দেশপ্রিয় পার্কে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম। ভর্তি হয়ে গেলাম নর্দান পার্কের ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে। ওখানে পেয়ে গেলাম গোপালদা (বসু) আর অরুণদাকে (অরুণলাল)। আসলে ওঁদের হাতে পড়ার পরই আমার সত্যিকারের উন্নতি হতে শুরু করল। আর আজ আমি ক্রিকেট খেলে যতটা এগতে পেরেছি, তা ঐ দুজনের জন্যই। আমাকে যেভাবে ওরা এখনও সব ব্যাপারে সাহায্যে করেন তা আর কারও ভাগ্যে জোটে কিনা আমার জানা নেই। জয়দীপের কথাবার্তার কৃতজ্ঞতার ভাব ছিল বেশ সুস্পষ্ট।

৮৬' সালেই জয়দীপ ডাক পান পাড়ার টীম দক্ষিণে কলকাতায় খেলার। ক্লাব আমাকে অবশ্য প্রথমবার অতটা গুরুত্ব দিতে চায় নি। কিন্তু সাতাশিতে আমি বেশ আত্মবিশ্বাসের সংগে খেলে ক্লাবের আস্থা অর্জন. করি। আর এবার তো জয়দীপ ব্যাট হাতে অপ্রতিহত। লীগে মোট ছটি শতরান করেছেন। এরমধ্যে পরপর পাঁচটি। এবার রণজি ক্রিকেট বাংলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। গতবছর ও বাংলা দলের দ্বাদশ ব্যক্তি ছিলেন। এবার নিয়মিত সুযোগ পেয়ে ও প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ৪৯ ও পরের ম্যাচে আসামের বিরুদ্ধে ৬২ রান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলা দলের হয়ে খেলতে গিয়ে খুবই টেনশন হয়। এখানে প্রত্যেক ম্যাচেই ভাল খেলতে হবে, নইলে বাদ পড়ার সম্ভাব না থেকে যায়। অথচ এখনকার ক্রিকেট সিজন এত কম যে, ঠিকভাবে নিজেদের তৈরি করার তেমন সুযোগ থাকে না। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে প্রায় সারা বছরই ক্রিকেট খেলা হয়। তবু এ বছরটাই আমার কাছে স্মরণীয়। যে মাঠে খেলেছি তাতে আশা করি বাংলা টীম থেকে বাদ পড়ব না। তবে আমাকেও ব্যাটিং-য়ে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।'

এখানকার ঘরোয়া ক্রিকেটে তেমন লোক হয় না, এই ব্যাপারটা জয়দীপের ক্ষেত্রেই ভাল লাগে না। বলবেন, 'মাঠে দর্শক থাকলে খেলতেও খুব আনন্দ লাগে। তবে কলকাতার বাইরে এই ক্রিকেট নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ আছে। এবারই রাঁচিতে বিহারের সঙ্গে আমাদের ম্যাচে মাঠে প্রচুর লোক হয়েছিল। এমন কি সিকিউরিটির্ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তবে মাঠে আরও বেশি পরিমাণ দর্শক আনার জন্য ক্রিকেটারদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।'

জয়দীপের স্বপ্ন ভারতের হয়ে টেস্ট খেলার। তবে এখন তাঁর লক্ষ্য আগামী অন্তত দুবছরের মধ্যে জোন খেলা এবং ঐ টীমেরই একজন স্থায়ী সদস্য হওয়া। তিনি এখন ব্যাটিংয়ে দারুণভাবে মনোনিবেশ করেছেন। প্রয়োজনে জয়দীপ অফ স্পিন বোলিং ও করে থাকেন। তবে ব্যাটিংয়ের জন্য বোলিংকে ততটা গুরুত্ব দিতে পারব না।

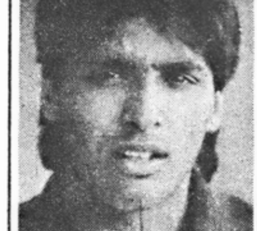
জয়দীপ বললেন, 'আমার আদর্শ খেলোয়াড় দুজন, কপিলদেব ও আজহারউদ্দিন। তবে গাভাসকারের খেলা আমার খুব ভাল লাগত। ওঁর ব্যাটিং আর দেখতে পাওয়া যাবে না, ব্যাপারটা যেন মেনেই নেওয়া যাচ্ছে না। এখন আমার প্রিয় ব্যাটসম্যান দিলীপ বেংগসরকার আর জাভেদ মিয়াঁদাদ। বোলার হিসাবে আমার ইমরানকে দারুণ পছন্দ।'

কলকাতায় ইস্টবেংগল বা মোহনবগানে না খেললে ক্রিকেটারদের গ্ল্যামারবাড়ে না। এ ব্যাপারটা মানতে চান না জয়দীপ। তাঁর মতে ছোট টীমে নিয়মিত ভাল খেললেও সুনাম কেনা যায়। এমনিতে ওঁর দক্ষিণ কলকাতা টীম ছাড়ার কোন ইচ্ছা নেই, বললেন, 'আমি সাধারণত তিন নম্বরে ব্যাট করে থাকি। আমার ক্লাব আমাকে সব সময়ে ঐ পজিশনে ব্যাট করার সুযোগ দেয়। এই সুবিধাটা কি মোহনবাগান বা ইস্টবেংগলে আদৌ পাওয়া যাবে? মনে হয় না।' বাংলার একজন উদীয়মান ব্যাটসম্যান হিসাবে আমরা চাই জয়দীপ আরও এগিয়ে যাক্ ওঁর লক্ষ্যের দিকে। আমাদের শুভেচ্ছা সব সময়ই ওঁর সংগে থাকবে।

জয়দীপের মত উঠতি ব্যাটসম্যান কমই দেখেছি : গোপাল বসু



কলকাতায় আমার কুড়ি বছরের ক্রিকেট জীবনে আমি জয়দীপের মত ব্যাটসম্যান খুব কমই দেখেছি। গত দু-বছর ধরে ও ধারাবাহিকভাবে রানের মধ্যে রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে এত সাফল্য পেলেও ব্যাটসম্যান হিসাবে ওর টেকনিক এখনও তেমন ধারাল হয়ে ওঠেনি। ওকে এখনও অনেক পথ এগতে হবে। ওর বয়স কম, পরিশ্রমও করতে পারে যথেষ্ঠ ও যদি ওর ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারে, তাহলে একজন ভাল ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে ওর কোন অসুবিধা হবে না বলেই মনে হয়।



টোটাল ফুটবল এখন আর কেউই খেলেনা: ক্রুয়েফ

জি সি দাস

ফুটবলের মহানায়ক হল্যান্ডের জোহান ক্রুয়েফ সম্প্রতি বলেছেন টোটাল ফুটবল কেবলমাত্র হল্যান্ডের এ্যাজাক্স আমস্টারডাম আর পশ্চিম জার্মানির বাইয়ারণ মিউনিখ ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউই এমন কি কোনও দেশই সত্যিকারের টোটাল ফুটবল খেলছে না। ৪০ বছরের ক্রুয়েফ আরও বলেন যে, সত্তর দশকে আমার অধিনায়কত্বে আমস্টারডাম আর বেকেনবাউয়ারের অধিনায়কত্বে মিউনিখ যে টোটাল ফুটবল খেলা উপহার দিয়েছিল সেটা জনসাধারণ নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। এর প্রমাণ হচ্ছে মাঠে অসাধারণ জনসমাগম; সত্তর দশকে এই দুটি দল বিশ্বের যেখানে যে কোনও খেলায় অংশ গ্রহণ করত মাঠে দর্শক উপচে পড়ত। এর প্রধান কারণ টোটাল ফুটবল এবং এ্যাটাকিং ফুটবল। আমরা অর্থাৎ আমি এবং বেকেনবাউয়ার সবসময়েই মনে করতাম ওপেন এ্যাটাকিং ফুটবলই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল। আর সেই আকর্ষণীয় ফুটবল খেলা সকলেই উপভোগ করতেন। সভ্য-সমর্থক ছাড়াও ফুটবল রসিকরাও আমাদের সাধুবাদ জানাতেন। সেই কারণেই ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়েও আজও আমরা জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছি। আমরা অনেকবার পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলে হেরেও গেছি এবং জিতেছি। ফলাফলে কিছু আসে যায় না, আসলকথা ফুটবল খেলে আমরা দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছিলাম। আর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণবন্ত ফুটবল, যেটা আমি এবং বেকেনবাউয়ার দুজনেই সেই সময়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আর সেই কারণেই সবসময়েই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে দর্শকদের মাতিয়ে রাখতাম।

আজ আমস্টারডাম কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মূল সংঘাতই হচ্ছে এই ফুটবল খেলা নিয়ে। বর্তমানে ফুটবল মাঠে দর্শক সমাগম হয় না কেন? এর প্রধান কারণই হচ্ছে ফুটবলাররা। আজ আর তাদের খেলা দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারছে না। যদি টোটাল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা প্রবর্তন করা যায় তবে আবার নিস্কেন, ইউসেবিও, পেলে, বেকেনবাউয়ার,



ম্যুয়েলার, টোস্টাও, জেয়ারজিনহো, রুডি ক্রল, রিভা, রিভেরাদের আবার ফিরে পাওয়া যাবে,আর মাঠেও ফুটবল খেলা থেকে আনন্দ পেতে দর্শকরাও আসবেন।

তিনি আরও বলেন যে এ্যাজাক্স আমস্টারডাম ছেড়েছি কারণ আজ আমি আমার মতামত অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ফুটবল এবং টোটাল ফুটবল ছাড়া কোনও দলের প্রশিক্ষণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ফুটবল মাঠে প্রশিক্ষক এবং ফুটবলারদের স্বাধীনতা দিতে হবে। কর্মকর্তাদের ইচ্ছায় ফুটবল খেলা চলতে পারে না। ফুটবল খেলাটা কর্মকর্তাদের থেকে প্রশিক্ষকরা আর ফুটবলাররা একটু বেশিই বোঝেন বলে আমি মনে করি এবং আপনারাও সেটা ভালভাবে জানেন।

আমার চিন্তাধারায় বলে চিত্তাকর্ষক ফুটবল খেলাটাই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। সেই কারণেই আমি যেখানেই প্রশিক্ষণ দিই না কেন, 'আমি ওপেন এ্যাটাক ফুটবল খেলার প্রবর্তন করব। এই চিন্তাধারা থেকে আমি কখনই সরে যাব না। এই খেলায় খেলোয়াড় হিসাবে আমি যেমন সাফল্য পেয়েছি, ঠিক তেমনিভাবেই প্রশিক্ষক হিসাবে গতবছর আমস্টারডামকে ডাচ লীগ আর ইউরোপীয়ান কাপ বিজয়ী করেছি। খেলায় আক্রমণাত্মক নীতিতেই আমি বিশ্বাসী। ফুটবল খেলায় যেমন ফলাফলটাও প্রয়োজন, ঠিক তেমনই প্রয়োজন আকর্ষণীয় ফুটবল খেলা। দর্শকরা পয়সা দিয়ে ফুটবল খেলা দেখতে আসেন, তাদের আনন্দলাভের দিকটাও নজর দেওয়া দরকার। আক্রমণাত্মক ফুটবল ছাড়া টোটাল ফুটবল অথবা চিত্তাকর্ষক ফুটবল কখনই সম্ভব নয় অথবা হতে পারে না। বর্তমানে যে ফুটবল খেলা চলছে তাতে করে ফুটবলকে বোধহয় খুব তাড়াতাড়িই কবরে যেতে হবে। অত্যন্ত রক্ষণাত্মক নীতির ফুটবল খেলা হচ্ছে কর্মকর্তাদের মর্জি মত ফুটবল খেলা। দল হারলে সভ্য-সমর্থকদের রোষে পড়তে হবে সেই ভয়ে এখন সকলেই পরাজয় এড়াতে চাইছেন। আর এই নীতি ক্ষতি করছে ফুটবলের। গদি রাখা এক কথা আর প্রাণবন্ত ফুটবল খেলা আর এক কথা। ফুটবল খেলাটা কর্মকর্তাদের নয় এটা হচ্ছে ফুটবলার আর দর্শকদের খেলা। ফুটবলার যদি দর্শকদের মর্জি মত ফুটবল না খেলে কর্মকর্তাদের মর্জিমত ফুটবল খেলে তবে সবদিকেই সমূহ ক্ষতি হতে বাধ্য।

স্পেন এবং ইতালির বহু ক্লাব এখন ক্রুয়েফ কে চাইলেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে কোথাও কার্যভার গ্রহণ করবেন না। এখন ভাল ফুটবল খেলা প্রায় হয় না বললেই চলে। সেই কারণে সারা বিশ্বে ফুটবলমাঠে দর্শক সমাগম অনেক কমে গেছে। ক্লাবগুলিও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ফুটবলকে প্রাণবন্ত করতে চাই আবার আক্রমণাত্মক ফুটবলের প্রবর্তন। ক্রুয়েফ মনে করেন এ কাজটা তিনি ভালভাবেই করতে পারবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বেকেনবাউয়ার যেমন জার্মানির ভার নিয়ে খেলার আমূল পরিবর্তন করবেন তেমনিভাবেই তিনিও ফুটবলের মরা গাঙে জোয়ার আনবেন।

অভিনব কোর্ট কেস

গত ১৯৮৬-৮৭ মরসুমে মার্চ মাসে টটেনহাম হট স্পার বনাম কুইনস পার্ক রেনজারস এর লীগের খেলায় ড্যানি টমাস সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। ইংলিশ লীগের ফিরতি খেলায় রেঞ্জার্স-এর ফরোয়ার্ড স্পারের ব্যাক টমাস-কে এমন প্রচন্ডভাবে চার্জ করেন যে, তাঁর দুটি হাঁটুই ভেঙে যায়। সুদীর্ঘ দশমাস চিকিৎসা করেও কোন উপকার হয় না এবং উঠতি তরুণ ব্যাক ড্যানি টমাস এর খেলোয়াড়ী জীবনের অবসান ঘটে। টমাস আর কোনও দিন মাঠে ফিরে আসবেন না তো বটেই, এমনকি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও সম্ভব নয়, কারণ দুটি পা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই স্পার টমাসকে বাতিল করে দিয়েছে। ফলে টমাস এখন প্রচন্ড আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি লন্ডন কোর্টে কুইনস পার্ক রেঞ্জার্স এবং তাদের ফরোয়ার্ড গ্যাভিন ম্যাগোর এর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এবং তাঁর অভিযোগ গ্যাভিন ইচ্ছাকৃতভাবেই, এই মারাত্মক ফাউল করে তাঁর খেলোয়াড়ী জীবন এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি প্রায় দশ কোটি টাকা দাবী করেছেন কুইনস পার্ক রেঞ্জার্স এবং গ্যাভিন ম্যাগারের কাছে। মামলায় যদি টমাস জেতেন তবে ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় এর সৃষ্টি হবে। এখনই এই মামলা সারা ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এবং ক্ষতিপূরণের দাবী মেনে নেওয়া হলে ভবিষ্যতে প্রত্যেক ফুটবলার সংযতভাবে ফুটবল খেলবেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ফাউল করা থেকে বিরত হবেন।

বাতাসে ধর্মের গন্ধ

সমীরণ গুহ

স্থান, হরিদেবপুর এলাকায় নতুন গড়ে ওঠা একটি একতলা বাড়ির ড্রয়িংরুম। সময় মাঘের সকাল। পরদিন বাগদেবীর আরাধনা। ফলে আকাশে-বাতাসে পুজোর গন্ধ। আমার চোখ ছিল দেওয়ালে টাঙানো একটি ফটোর দিকে। চৌষট্টির বি এন আর অধিনায়ক বিজয়ী হয়ে মহারাষ্ট্রের গভর্নরের স্ত্রীর হাত থেকে রোভার্স কাপটি গ্রহণ করছেন। এমন সময়েই নায়কের প্রবেশ। ছ'ফুট দেড় ইঞ্চির মত সুঠাম দেহের দীর্ঘ মানুষটা আমার সামনের চেয়ারটাতে এসে বসলেন – যিনি একষট্টি থেকে সত্তর সাল পর্যন্ত টানা দশটি বছর বি এন আরের ম্যাচ থাকলে বসে থাকার কথা কখনও চিন্তাই করেননি। যাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল, যখন যে টীমেই খেলি না কেন – এক নম্বর গোলকিপার হিসেবেই দলে থাকব, নয়তো নয়। সেই দীপক দাস প্রথমেই আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদার টানটান সুরে বললেন, আটাত্ম এবং উনষাটে ইন্টারন্যাশনাল ও খিদিরপুরে খেলার পর ষাটে যোগ দিই রাজস্থান ক্লাবে। সেবারের লীগে আমাদের স্থান ছিল চতুর্থ এবং 'আমার' খেলাটাও দর্শকরা, কর্মকর্তারা পছন্দ করলেন। ফলে একষট্টির মরসুমে ইস্টবেঙ্গল ও বি এন আর দুটো ক্লাবই আমাকে পেতে চাইল। ইস্টবেঙ্গলে তখন দুই গোলকিপার। নাণ্টা গুহ ও অবনী বসু। একজন গোলকিপার অবশ্য মোহনবাগানে চলে যাবেন। তা যিনিই যান না কেন, ইস্টবেঙ্গলে সই করলে আমাকে সেই দু'নম্বর গোলকিপার হিসেবেই থাকতে হবে। কিন্তু বসে থাকার জন্য তো ফুটবলটা শিখিনি। বি এন আরের দেবু ঘোষ বললেন, "আমার টিমে কিন্তু তুমিই এক নম্বর গোলকিপার।" সুতরাং আর কোন চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার ছিল না। ঐ একষট্টিতে বি এন আরেই সই করলাম।

পরে তো এক নম্বর গোলকিপার হিসেবেই ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান থেকে ডাক পেয়েছিলেন। তখন যান নি কেন?

হাঁ, ইস্টবেঙ্গল দুবার এবং মোহনবাগানের শঙ্করী ঘোষালের সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল। কিন্তু ঐ দুই ক্লাবই টাকা নিয়ে খেলার অনুরোধ করেছিল যেখানে আমার প্রয়োজন ছিল একটা চাকরির। কেন-না বি এন আরের নিশ্চিন্তের চাকরি ছেড়ে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে খেলার মোহ আমার ছিল না।

বি এন আর অর্থাৎ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের আপনি তো এখন স্পোর্টস সুপারভাইজার---।

হাঁ এবং আরও এগিয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে। দীপক দাস বললেন, আমাদের খেলোয়াড় জীবনে রেলের চাকরিটাই ছিল সম্মানের। যে কারণে একবার ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েও যাইনি। অথচ ব্যাঙ্কের সেই চাকরিই আজ কত উঁচুতে। না, ওসব নিয়ে আপশোস করে এখন আর কোন লাভ নেই।

আচ্ছা, আপনি গোলকিপারের পজিশনটাই বেছে নিলেন কেন? চমৎকার এই হাইটটার জন্যে?

আসলে আমার দাদা কে দাসও ছিলেন প্রথম ডিভিশনের গোলকিপার। সেটাই মূলমন্ত্র। এখন যেমন আকাঙ্ক্ষা আমার ছেলেও যেন ঐ বারপোস্টের নিচে গিয়েই দাঁড়ায়।

আমরা আপনার বহু নজর-কাড়া ম্যাচ দেখেছি। অসাধারণ হয়ে ওঠার সেসব ছবি আমাদের চোখের কোণে এখনও লেগে রয়েছে। কিন্তু আপনার নিজস্ব ভোটটি পাবে কোন ম্যাচটা?

সহসা দীপক দাসের সারা মুখে জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়ল। বন জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়ে তিনি অদ্ভুত এক শীতলকণ্ঠে বলতে লাগলেন, তেষট্টির লীগ ম্যাচ। আমাদের বি এন আরের সঙ্গে ইস্টার্ন রেলের খেলা। আমাদের দলে অরুণ ঘোষ, বলরাম আপ্পালারাজু, রাজেন্দ্রমোহন, ভারালু এবং অপরপক্ষে প্রদ্যোৎ বর্মন, পি কে ব্যানার্জি, দীনু দাস, তাপস সোমের সমাবেশে দুই রেলের ধাক্কাধাক্কির লড়াই দেখতে মাঠ ছিল পরিপূর্ণ দর্শকে ভরা। ওদিকে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছিল সমানে। বলরামের দেওয়া এক গোলে আমরা এগিয়ে যেতেই শুরু হল ইস্টার্ন রেলের ছন্দময় এক খেলা। সেই খেলাটা এক সময় শিল্পের পর্যায়ে চলে গেল। দীনু দাস, পি কে তখন গোল পাওয়ার জন্য দুরন্ত সব শট নিয়ে আমাকে অনবরত মুশকিলে ফেলার চেষ্টায়। কিন্তু আমি ছিলাম সেদিন অপরাজিত। ঐদিন আমার বিপক্ষে যদি চারটে গোলও হতো তাহলেও কিছু বলার ছিল না। আমি সমান অভিনন্দিতই হতাম।

একষট্টিতে বি এন আরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আপনার খেলা যেন ক্রমশ দর্শকের চোখে রঙের মুকুল ধরিয়ে দেয়। আরও কয়েক বছরে সেই মুকুলগুলি ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঐ সময়ের কথা কিছু বলুন।

একষট্টির লীগে আমরা রানার্স হই। দীপক দাসকে কোনরকম ভাবনা-চিন্তা অথবা হিসেবের খাতা খুলে ধরতে হ'ল না। তিনি এক ঝলকেই বলে উঠলেন, আঠাশটা ম্যাচ খেলে আমার বিপক্ষে গোল হয় মাত্র সাতটা – যেখানে বড় টিমের তারকা গোলকিপাররা গোল খায় আমার থেকেও বেশি। তেষট্টির শীল্ড চ্যাম্পিয়ন আমরাই হই। এবং শীল্ডে আমার বিপক্ষে একটা মাত্র গোল হয়। চৌষট্টিতে আমরা রোভার্স কাপ জয় করি। সেই টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল এবং ফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়েই ট্রফি পাই। আর সারা টুর্নামেন্টে আমি মাত্র একটাই গোল খাই। ছেষট্টির শীল্ড এবং সাতষট্টির ডুরান্ড কাপের ফাইনালে দু'বারেই আমরা ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০–১ গোলে হেরে রানার্স হই। দেশের শক্তিশালী এক প্রধান ক্লাবের কাছে হারাটা অগৌরবের নয় – গৌরবের ব্যাপারটা হল, তারা আমাদের নামমাত্র গোলে হারিয়েছে। এবং ডুরান্ডের ফাইনালের ফলাফল ১–১ হলেই মানানসই হ'ত। অরুণের চমৎকার হেডটা গোলে না ঢুকে বারে লেগে ফিরে আসে। ড্র হলে যুগ্মজয়ী হতাম। খেলার মধ্যেও ভাগ্যের একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা সেদিন ভাগ্যের সহায়তা পাইনি। তবে এটাও তো ঠিক, মাঝারি শক্তির একটা দল হয়ে আমরা আমাদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা দেখিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবলে একটা ঢেউ নিশ্চয়ই তুলতে পেরেছিলাম। নয়'ত শীল্ড জয়, রোভার্স জয় এবং আবার শীল্ডের ও ডুরান্ডের ফাইনালে ওঠাটা কি শুধুই ভাগ্যের করুণায়? আসলে আমাদের টিমে ছিল সুপার এক্সপ্রেসের গতি। এবং সেই গতির চাকায় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বহুবারই কাটা পড়েছে। নয়'ত আহত হয়ে অর্থাৎ ড্র করে শীর্ষে থাকার লাইন থেকেছিটকে বেরিয়ে গেছে।

ষাটের দশকে পেনাল্টি শট বাঁচানোয় আপনার যথেষ্ট সুনাম ছিল। আপনি যেন দুই হাতে আঠা লাগিয়ে বলকে ধরে ফেলতেন। কখনও ফিস্ট করে বার করে দিতেন। অথচ ঐ পেনাল্টির সময়েই আপনার সঙ্গে রেফারির যত গন্ডগোল বেধে যেত। একবার তো আর কে দত্তর সঙ্গে আপনার তর্কাতর্কিই শুরু হয়ে গেল। সেই সম্পর্কে কিছু বলবেন?

রেফারি আর কে দত্তর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে খেলা সেদিন দশ মিনিটের ওপর বন্ধ ছিল। কিন্তু আমার অপরাধটা কোথায় বলুন তো? আশা করি বড় টিমের সদস্য সমর্থকরাও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, তাদের সঙ্গে খেলায় সময় ছোট বা মাঝারি ক্লাবগুলোর ওপর অবিচারটা বেশ ভালোই হয়। দীপক দাস এরপর মুখর হলেন। বললেন, সেটা ছিল পঁয়ষট্টি সাল। আমাদের বি এন আরের সঙ্গে মোহনবাগানের রিটার্ন লীগ ম্যাচ। লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ঐ ম্যাচটা জেতা অত্যন্ত জরুরী। সেই অবস্থায় খেলা শুরু হ'ল। রেফারি আর কে দত্ত এক সময় আমাদের বিপক্ষে একটা পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন। জার্নেল সিং, কিক নিতে এলো। এবং সেই শট আমি বাঁচিয়ে দিই। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে রি-কিকের আদেশ দিলেন। আমি নাকি শট নেওয়ার আগে নড়াচড়া করেছি। জার্নেলের দ্বিতীয় শটটাও সেভ করে দিই। আর কী আশ্চর্য দেখুন, সেবারেও আর কে দত্ত বললেন, "তুমি আবারও নড়েছো। অতএব আবার রি-কিক।" এসব অন্যায় সহ্য হয়? ফলে রেফারির সঙ্গে আমার তুমুল তর্কের ঝড় উঠল। আমরা মাঠ থেকে বেরিয়েই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের কর্মকর্তারা আমাদের বুঝিয়ে খেলা চালিয়ে যেতে বলেন। ফলে আমি গিয়ে আবার বারপোস্টের নিচে দাঁড়ালাম। তবে এক অভিনব পদ্ধতিতে। আমি আবার বল ধরব, রেফারি আবার নড়ার অপরাধে রি-কিকের নির্দেশ দেবেন – অর্থাৎ যতক্ষণ গোল না হয় উনি এই খেলাটাই চালিয়ে যাবেন। তারচেয়ে গোলটা খেয়ে নেওয়াই ভালো। অন্তত প্রহসনের নাটকটা বন্ধ হবে। আমি তাই করলাম কি জানেন, জার্নেল সিং যখন



দীপক দাস



স্ত্রী মিত্রা, কন্যা দীপিকা এবং পুত্র দেবদুলালের সঙ্গে দীপক দাস

শট নিচ্ছে আমি তখন গোলের পেছন দিকে মুখ করে দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছি। আর কে দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আমাকে বললেন, "সোজা মুখ করে দাঁড়ান।" কতক্ষণ আর ধৈর্য থাকে বলুন? আমি রেফারিকে স্পষ্টই জানালাম, আপনি তো মোহনবাগানকে একটা গোল পাইয়ে দেবেন আপনার অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে? আমি যেদিকেই মুখ করে থাকি না কেন সেটা আমার ব্যাপার। আপনি এবারে একটা গোলের বাঁশি বাজাতে পারবেন! দত্ত মহাশয় জানালেন, "রীতি বহির্ভূত হয়ে দাঁড়ালে তো চলবে না।" অতএব রীতি মেনে আমি এবারে জার্নেলের দিকে মুখ করেই দাঁড়ালাম। তবে নতুন আর এক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানিয়ে; আমি স্বামী বিবেকানন্দের ঢঙে দুই বগলে হাত দুটো ঢুকিয়ে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। গোল হয়ে গেল।

কিন্তু চৌষট্টির গুয়াহাটি ন্যাশনালে আপনাদের রেলের সঙ্গে বাংলার ফাইনালে আসামের রেফারিও আপনার বিপক্ষে একই অভিযোগ করেছেন। ব্যাপারটা কী?

হ্যাঁ, সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে আমরা তখন ১ গোলে জিতছিলাম। ঐ সময়ে আমাদের বিপক্ষে একটা পেনাল্টি হয়। দীপক দাস মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু সাহস করে শট নিতে কেউ এগিয়েই আসছে না। আমি তো তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার সুদীর্ঘ হাত দুটো গাছের শাখার মত মেলে ধরেছি। কোন ফাঁক খুঁজে না পেয়ে অরুময় তো সেই পেনাল্টি শটটা বাইরেই মারল। তখনই রেফারি জানালেন, আমি নড়ে গেছি অতএব রি-কিক। রি কিকটা এবারে নিতে এলো দেবনাথ। বুটের ডগা দিয়ে কোনাকুনি শটে গোল পায়। ১–১ ড্র। এবং পরে আমরা আরও একটা গোল করে২–১, ফলে বিজয়ী হয়ে সন্তোষ ট্রফি পাই।

সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হল, যতই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রেফারির বিরুদ্ধে আনা হোক না কেন, দুই রাজ্যের দুই রেফারিই পেনাল্টি শটের মুহূর্তে আপনার নড়াচড়ার জন্য রি-কিকের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি কী সত্যিই একটুও নড়তেন না?

না। অত্যন্ত বলিষ্ঠ উত্তর দীপক দাসের। তিনি দীপ্ত স্বরেই বললেন, ব্যাপারটা কি হয় দেখুন। নিয়ম অনুযায়ী গোলকিপারকে টো-য়ের ওপর দাঁড়াতে হবে এবং পা দুটো সামান্য একটুও নড়ানো যাবে না। আপনার বড়ি যতই নড়ুক না কেন সেটা কিন্তু অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আমার বডি অত্যন্ত ফ্লেক্সেবল বলেই স্থির পায়ে দাঁড়িয়েও আমার কোমরটা মৃদু দুলে উঠত। আর রেফারিরা ভাবতেন পা না নাড়িয়ে ঐভাবে কোমর দোলানো যায় না। অসম্ভব কাজটাকে সম্ভবে পরিণত করতে পারতাম বলেই রেফারিরা দ্বন্দ্বে পড়ে যেতেন কিন্তু সেটা কী আমার অপরাধ?

রেফারি এবং রি কিকের প্রসঙ্গ ছেড়ে এবারে পেনাল্টি সেভের গল্প বলুন - যিনিই শট নিতে



পুরস্কারের সামনে পল্লবিত হৃদয়ে

আসুন না কেন, আপনাকে পাহাড়ের মত গোলপোস্ট আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু না একটু দোনোমনা হতেনই। সেই গল্পগুলোই শুনতে চাই।

দোনোমনা কে হত না হত তা অবশ্য জানি না – তবে এটা দেখতাম, পেনাল্টিটা কেউ নিতে চাইত না! একে অপরকে অনুরোধ করত। দীপক দাস সামান্য হেসে বললেন, তেষট্টির লীগে আমাদের সঙ্গে মোহনবাগানের 0–0 ড্র হয়। ঐ ম্যাচে মোহনবাগানের পক্ষে পেনাল্টি শট মারতে আসে চুনী গোস্বামী। না, গোল হয়নি। বল ধরে ফেললাম। চৌষট্টিতে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ম্যাচ। ওরা পেনাল্টি পায়। কিন্তু রামবাহাদুর, পি দে কেউই শট নিতে ইচ্ছুক নয়। অসীম মৌলিককে যেন ধরে বেঁধেই পাঠানো হল। আমাকে অবশ্য কিছু করতে হয়নি। শট বাইরে চলে যায়। ম্যাচটা 0–0 ড্র। ঐ চৌষট্টিতেই মহমেডানের সঙ্গে খেলায় ওরাও আমাদের বিপক্ষে পেনাল্টি পায়। রহমতুল্লা শট নিতে আসে। বাঁ দিকে ঝুঁকে ওকে আমি ফোর্স করি ডানদিকে মারতে। এবং রহমতুল্লা সেই ডানদিকে মেরেই আমার পরিকল্পনায় ধরা পড়ে। আমি ওর শট ধরে নিই। ঐ ম্যাচটা আমরা ১–0 গোলে জিতি। সাতষট্টিতেও মোহনবাগান আমাদের বিপক্ষে পেনাল্টি পায়। অরুময়ের শট বাঁচিয়ে দিই।

আর বাজে গোল খেয়ে নিজেকে এখনও দায়ী করছেন এমন কোন অনুতাপের ঘটনা?

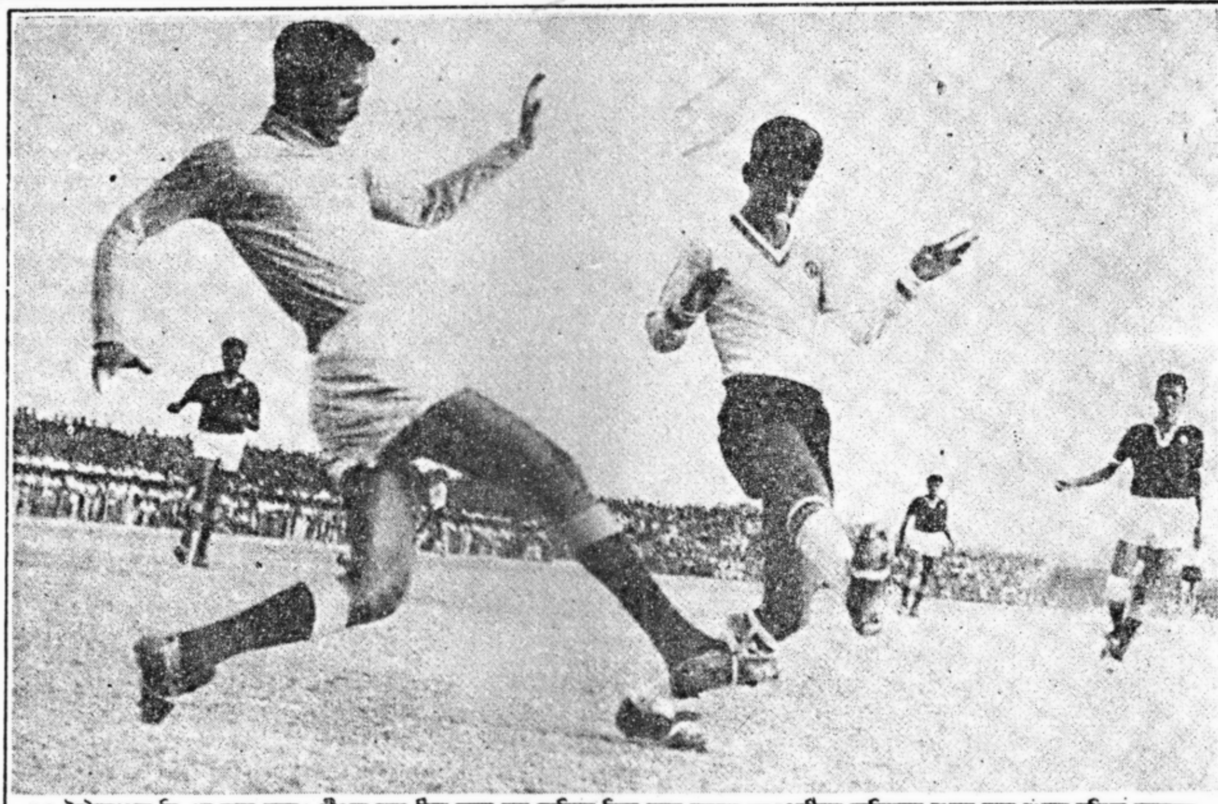
তাও আছে একটা। দীপক দাস বললেন, সালটা সম্ভবত ছেষট্টি হবে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ। সুকুমার সমাজপতির কর্নার কিকটা একেবারে বারের মাথা ঘেঁষে নেমে আসছে! আমাকে ধাক্কাধাক্কি কেউ কিছুই করেনি! সামান্য একটু ডিস্টার্বও নয়। আমি নিশ্চিন্তে লাফিয়ে বলটাও ধরলাম। কিন্তু ধরার সময় গ্রিপটা ঠিক ছিল না। হাতটা একটু ঘুরে যেতেই বলটা বারের জাল স্পর্শ করে। সেই বলটা যে আজও আমি কল্পনায় কতবার রক্ষা করে চলেছি তা আমিই জানি।

তেষট্টি থেকে আটষট্টি পর্যন্ত – এই সময়টায় আপনি ছিলেন ভারতের প্রথম সারির গোলকিপারদের মধ্যে একজন। পাঁচ ছ'বার ন্যাশনাল খেলে দুবার ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। এছাড়া ক্লাবভিত্তিক সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে বেশ কয়েকবার ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। তা সত্ত্বেও একবার সাউথ ভিয়েতনামের যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যুব ভারতীয় দলে নির্বাচিত হওয়া ছাড়া সিনিয়র ভারতীয় দলে কোন সুযোগই পেলেন না – এই সম্পর্কে কিছু বলার আছে?

দেখুন, এখন বললে তো সকলেই ভাববেন, সিনিয়র ভারতীয় দলের ব্লেজার না পেয়ে আমি আজ অহেতুক কান্নাকাটি করছি।

সেকথা কেউই ভাববেন না। ভারতীয় খেলাধুলোর জগতে বঞ্চনার ইতিহাস মোটামুটি সকলেরই জানা। আপনি বলুন –

আমি যাকে দায়ী করব তাঁর নাম খলিফা জিয়াউদ্দিন! অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দীপক দাস সোজাসুজি বললেন, কখনও কোষাধ্যক্ষ, কখনও সচিব, কখনও সহ সভাপতি আবার কখনও সভাপতি – যখন যে পোস্ট নিয়েই থাকুন না কেন, একজন মানুষ পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ বছর ধরে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের একচ্ছত্র ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছেন এটা ভাবা যায়? এটা কী সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, গঠনমূলক কোন নজির নাকি ভারতীয় ফুটবল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে তারই ছবি? দীপক দাস এবারে একটু উত্তেজিত হলেন। বললেন, আমার স্কুলজীবনে জিয়াউদ্দিন সাহেব ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের ক্ষমতাধর পুরুষ। আমি ফুটবল খেললাম



৬৭ ইস্টবেঙ্গল-বি এন আর ম্যাচ। দীপক দাস ঠিক সময় মত বেরিয়ে কিক করে বলকে দূরে পাঠিয়ে হাবিবকে গোল করা থেকে বঞ্চিত করছেন.

তেরো চোদ্দ বছর এবং অবসর নিয়েছি তাও সতের, আঠারো বছর হয়ে গেল - এখনও সেই জিয়াউদ্দিন সাহেবই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে? আমার ছেলে যখন ফুটবল খেলবে এবং ফুটবল থেকে একদিন সরে যাবে তখনও দেখবেন এই ভদ্রলোকই তাঁর জায়গায় ঠিকই থাকবেন। এটা অনাচার।

আপনার মধ্যে দুরন্ত এক অভিমান, ক্ষোভ, স্বপ্নভঙ্গের হতাশা সব কিছু মিলে জমাট এক পাথরের মত এমনভাবে বুকে চেপে আছে যে ।

তা আছে। জমাট বেঁধেই আছে। দীপক দাস আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগলেন, আমরা খেলোয়াড়েরা জাত মানি না। আমরা ফুটবলার আমাদের ধর্ম ফুটবল। আমাদের সময়ে চোঙা মত কলাইয়ের একটা বড় ক্যানে জল ভরা থাকত। হাফ টাইমে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুচি, মেথর– কোন ভেদাভেদই ছিল না– আমরা সকলেই ঐ ক্যানে চুমুক দিয়ে জল খেতাম। অথচ দেখুন আমাদের ঐ অখন্ডতা, এক প্রাণ এক আত্মাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতেন জিয়াউদ্দিন সাহেব কোটা সিস্টেমে ভারতীয় দল গড়ে। কারো কারো ওপর আবার বিশেষ দুর্বলতাও দেখাতেন। এই দেখুন না– সাতষট্টির মারডেকা টুর্নামেন্টে থঙ্গরাজ বিশেষ করে মুস্তাফার সেবছর কোন পারফরমেন্সই ছিল না। অথচ ওদেরকেই নির্বাচিত করা হল, আর আমি ফর্মে থেকেও বাদ! আমার সোনার বছর ছিল তেষট্টি এবং চৌষট্টি সাল। সেই তেষট্টির প্রি-অলিম্পিকের জন্য দিল্লি ক্যাম্পে না ডাকলে নয়, তাই ডাকা হ'ল। আমরা চারজন গোলকিপার ছিলাম। আমি, বর্মন, থঙ্গরাজ এবং সেলিম। সেই সেলিমেরও দলে জায়গা হয় অথচ আমার হয় না। আর চৌষট্টিতে তো আমাকে মারডেকা ক্যাম্পে ডাকাই হ'ল না। আর আশ্চর্যের ব্যাপারটা কি জানেন, রোভার্স কাপ জয় করে আমি ছিলাম ঐ বছরে পারফরমেন্সের নিরিখে অনেকের ওপরেই। রোভার্স কাপের ফাইনালটা দারুণ খেলতেই জিয়াউদ্দিন সাহেব সম্ভবত লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। খেলার শেষে আমাকে বললেন, "বেটা বহুৎ আচ্ছা খেলা – অ্যায়সা হি খেলতে যাও।" শুনে তো আমার রাগ বাড়ল ছাড়া কমলো না। আমাকে বাদ দিয়ে আমারই পিঠ চাপড়াচ্ছেন, এটা অসহ্য। ঐ ভনিতা আমার সহ্য হ'ল না। আমি ওঁর মুখের ওপর স্পষ্টই জবাব দিলাম ভালো খেলে লাভটা কী? আপনি কী আমাকে ভারতীয় দলে নির্বাচিত করবেন? করবেন না। আই হ্যাভ নো পেরেন্টস – আপনাকে ধরাধরি করার জন্য ফুটবলে আমার কোন পিতা-মাতা নেই। অনাথ একটা ছেলেকে কে দেখবে? হাঁ – ঐ কথা শোনার পর জিয়াউদ্দিন সাহেব আমার সামনে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াননি। কী করে দাঁড়াবেন? কারণ তাঁর বিবেকটা তো জানে, কীভাবে তিনি সেলিম, মুস্তাফাকে ভারতীয় দলে খেলিয়েছেন আমাকে বঞ্চিত করে। সেই অপরাধ বোধ একটু না একটু তো কাজ করবেই!



সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের দেওয়া এক পার্টিতে কপিলদেব। তাঁর বাঁ পাশে দীপক দাস


New Year's Gift from
AKG
FREE
with 500 gms. & 200 gms. of every JAM, JELLY, CHUTNEY & PICKLES
OFFER VALID TILL STOCK LASTS
– a healthy temptation



সপ্তম নেহরু গোল্ডকাপে রাশিয়া (বাঁদিকে) ও বুলগেরিয়া ম্যাচের আগে দু দলের খেলোয়াড়রা।

ছবি : উৎপল সরকার